- পঞ্চম অধ্যায় -

একগুচ্ছ রূপক কাব্য —— একটি পর্যায় (১৮৫৫ - ১৮৮১)

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য রচিত হচ্ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদলে - একথা সর্বজনস্বীকৃত। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা বাঙালী মনীষীগণের চিত্তে যে আলোড়ন তুলেছিল তারই প্রকাশ ঘটেছিল সাহিত্যের নানা ধারায়। তবে একথা সত্য যে ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও বাঙালীর বাঙালীতম প্রাণ সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য আদর্শকে ত্যাগ করতে পারেনি। তাঁরা ইংরেজীভাব ও দেশীভাবপ্রবণতার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। চতুর্থ অধ্যায় আলোচনার মাধ্যমে - রূপকাব্য এমনই একটি প্রয়াসের ফসল - বোঝাতে চেয়েছি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নবজাগরণের অন্যতম মূলমন্ত্র' ইতিহাসচেতনায়' উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেছিলেন উদ্দীপনাপূর্ণ দেশরাগমূলক কাহিনীকাব্য - পদ্মিনী উপাখ্যান (২য় সংস্করণ - ১৮৬৫), কর্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮) প্রভৃতি। মধুসূদনের হাতে এই কাহিনীকাব্য গোত্রান্তর লাভ করে সমুন্নতি লাভ করল সাহিত্যিক এপিকে। যুদ্ধ বর্ণনাসংকুল' মেঘনাদবধ' কাব্য (১৮৬২) রচনা করলেন তিনি। মাইকেলকে অনুসরণ করলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীচন্দ্র সেন। বাঙালীর জাতীয় জীবনের এক একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে এঁরা রচনা করলেন এক একটি মহাকাব্য — যথাক্রমে বৃত্রসংহার কাব্য (১৮৭৭), রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)। কিন্তু লক্ষণীয় এ সময় রূপক কাব্যগুলিও লেখা হয়েছে। প্রথম রূপক কাব্যের প্রকাশ কাল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যশিষ্য দ্বারকানাথ অধিকারী রচিত' সুধীরঞ্জন নামক রূপক রচনাটি উত্তরপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়। 'সুধীরঞ্জন" কাব্যটি ছাড়া অন্যান্য রূপক কাব্যগুলি যেমন : — সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মাদকমঙ্গল' (১২৭৪), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ' যৌবনোদ্যান' (১৮৬৮), বলদেব

পালিতের ''কাব্যমঞ্জরী'' (১৮৬৮), শিবনাথ শাস্ত্রীর' নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮) ও' ছায়াময়ী পরিণয়' (১৮৮১), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের' আশাকানন' (১৮৭৬) ও অক্ষয়চৌধুরীর উদাসিনী' (১৮৬৮)' ছায়াময়ী' (১৮৮০) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) - এ সময়েরেই রচনা ।

বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় একই সময়ে মহাকাব্য, রূপকাব্য এমনকি খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্যও রচিত হয়েছে । তাছাড়া, একই কবির মধ্যে বিচিত্র কাব্য প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছে । যেমন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে মহাকাব্য লিখেছেন, একদিকে খণ্ডকাব্য, অন্যদিকে সাথে সাথে লিখেছেন রূপকাব্য । সুতরাং আমরা এ থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে নিয়ত পরিবর্তমান জগতে কিছুই দীর্ঘস্থায়ী হয় না । মহাকাব্যে আখ্যানের একটা বিশেষ স্থান ছিল । কাব্য সাহিত্য ধীরে ধীরে সেই আখ্যানের নির্মাক ত্যাগ করতে লাগল - কারণ গদ্যের জন্মের পর কাহিনী বলার দায়িত্ব এসে গেল গদ্যের হাতে । '' কিন্তু ভূত হইয়াও প্রাচীন কবিতা আর বেশিদিন ভর করিয়া রহিতে পারিল না । উদীয়মান গদ্যরীতির কাছে আদিরসাত্মক পদ্যরীতি পদে পদে হার মানিতে লাগিল ।'' ১ আখ্যানকে ত্যাগ করে কাব্যসাহিত্য এগিয়ে চলল খণ্ড কবিতা ও গীতি কবিতার পথে । উনবিংশ শতকের এই সময়টিকে বাংলা সাহিত্য আখ্যানের মোহ সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি, আবার পুরে পুরি গীতিকাব্য হয়ে উঠেনি (বিহারীলাল আধুনিক গীতি-কবিতার উদ্গাতা), আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শ লাভ করেছে কিন্তু মধ্যযুগীয় নীতি ত্যাগ করতে পারছে না - তখনই কবিগণ কবিতায় ভাব প্রকাশের জন্য এক বিশেষ রীতি বা আঙ্গিককে গ্রহণ করলেন - সেটি রূপকের রীতি - জন্ম হল রূপক কাব্যের ।

প্রাচ্য (দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের' স্বপ্নপ্রয়াণ') এবং পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ রূপকাব্য

১। ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড , ১৩৬২ , পৃ - ১৫৭ ।

-গুলির অনুসরণে * এবং বিশ্বকোষের সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ রূপক কাব্যের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় । যেমন : - ক) রূপককাব্যে দুটি অর্থ সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হবে এবং প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির অর্থ প্রতীয়মান হবে ।

খ) বিচ্ছিন্নভাবে নয় সম্পর্কান্বিতভাবে রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার ও পরিকল্পনাগত সৌষ্ঠব থাকবে ।

গ) অমূর্ত ভাবনাকে বা কবির বিশেষ কোন তত্ত্বকে মূর্ত রূপ দান করা হবে অথবা অচেতন বস্তুর উপর চেতন বস্তুর রূপারোপ হবে ।

ঘ) মহাকাব্যে যে বাহ্যিক ভৌগোলিক পরিভ্রমণের সন্ধান পাওয়া যায় - রূপককাব্যে সে ভ্রমণ নয় — ভৌগোলিক বিবরণ থাকা সত্ত্বেও সেটি কবির মানসিক আভ্যন্তরীণ পরিভ্রমণের চিত্র বা কবি প্রতিভা উন্মেষের চিত্র তা থেকে পরিস্ফুট হবে । এই ভ্রমণ চিন্ময় ।

ঙ) অনেক রূপককাব্যের ক্ষেত্রেই কবি - নায়কের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন ।

চ) নায়ক বা নায়িকার নিদ্রা যাওয়া ও নিদ্রাভঙ্গের মধ্যে স্বপ্নদর্শন রূপক কাব্যের একটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ।

এছাড়া একটি আখ্যানগ্রহণ, নীতিব্যাখ্যা ও কোন নদীতীরে কোন দেবীর সাক্ষাৎ লাভ ইত্যাদি রূপককাব্যের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের এই পর্যায়ের রূপক কাব্যগুলির পর্যালোচনা করা যেতে পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' স্বপ্নপ্রয়াণ ' বিস্তৃত আলোচনার অবসর রচনা করে বলে - কাব্যটির আলোচনা পরবর্তীতে করা হয়েছে ।

---

*যেমন :- Bunyan এর ' Pilgrims Progress,' Spenser এর ' Faerie Queene' এবং Dante এর ' Divine Comedy.'

রঙ্গকবি ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য দ্বারকানাথ অধিকারীর' সুধীরঞ্জন' প্রথম প্রাপ্ত রূপক কবিতা সঙ্কলনের বই। বইটির প্রকাশকাল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। বইটি সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেছেন, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্বক ছাত্র গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী দ্বারকানাথ অধিকারী এই গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ইহাতে গদ্য ও পদ্যে অনেকগুলি নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা বিশুদ্ধ বটে – সকল রূপকগুলিই ভাল না লাগুক অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ১৭৭৭ শকে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'দ্বারকানাথ অধিকারী মহাশয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সম্বাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। প্রভাকরে প্রকাশিত প্রথম কবিতা'' তত্ত্বপ্রকরণ,'' ৩রা জুলাই, (১৮৫২) এবং শেষ প্রকাশিত কবিতা'' বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজীভাষার কথোপকথন,' ১৬ই আগষ্ট,(১৮৫৪)। মধ্যবর্তীকালে তাঁর যে সব কবিতা প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু কিছু' সুধীরঞ্জন' বইতে সঙ্কলিত হয়েছে। এ তথ্য আমরা পেয়েছি ডঃ ভবতোষ দত্ত মহাশয় সম্পাদিত'' বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'' গ্রন্থ থেকে।

' সুধীরঞ্জন' বইটি কয়েকটি কবিতার সঙ্কলন হলেও বইটির সম্পাদক দ্বারকানাথপুত্র নীলরতন অধিকারী মহাশয় চারটি অধ্যায় বইটির বিন্যাস করেছেন। প্রথম অধ্যায় আছে পাঁচটি কবিতা। যথা :- পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন, 'তত্ত্বপ্রকরণ', 'মনের প্রতি-উপদেশ' (সম্বাদ প্রভাকর, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫০), ' মাতৃস্নেহ' ও' রাজার আদিকরণ'।

দ্বিতীয় অধ্যায়'' মনের রাজত্ব'' নামক দীর্ঘ সলাপাত্মক কবিতার বিস্তার। তৃতীয় অধ্যায় – চারটি কবিতার সংকলন -'' ভরতবর্ষের বিলাপ,'' '' সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ,'' দ্বেষ এবং প্রবোধের সহিত সুশীলের বিবাদসূত্রে দ্বেষের প্রতি প্রকৃতি সতীর উপদেশ'' ও চতুর্থ কবিতা'' কৃষ্ণনগর কলেজের রোদন'' এবং'হিন্দু কালেজের সহিত কথোপকথন''। চতুর্থ অধ্যায়ে '' পরদার নামক একটি রূপকাত্মক কবিতা আছে।

সুধীরঞ্জনের কবিতাগুলি ছাড়াও তিনি ''কালেজীয় কবিতা যুগ্মে'' যে সকল কবিতা লিখেছিলেন তারও কয়েকটি রূপকধর্মী।'' অসভ্য ও তদীয় পায়ক পুত্রের বৃত্তান্ত'' ও'' সরস্বতীর খেদ ও দ্বিতীয় বরপুত্রের সহিত কথোপকথন'' কবিতা দুটি রূপক জাতীয় রচনা। ' সুধীরঞ্জন' - গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের কবিতাগুলি নিতান্তই কবিতা। এগুলিতে কবি রূপককে আশ্রয় করেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ের' মনেররাজত্ব' কবিতাটি রূপকাত্মক। কবিতাটির বিষয়বস্তু এইরূপ :- অখিলেশ নামে এক নরপতি অসীমবুদ্ধির বলে সুরলোকে আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি আপন পুত্রের মত প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। তাঁর রাজ্যে সুখের অভাব রইল না। কিন্তু দিনদিন তাঁর রাজ্যের ভার বাড়লে, তাঁর পক্ষে এসব দেখা দুরূহ হয়ে পড়ল। তখন রাজা অখিলেশ মনকে সৎ মহাজন ভেবে রাজত্বের কিছু অংশের ভার তাকে দিলেন। মন কামদেবের সহায়তায় রাজ্য-শাসন করতে আরম্ভ করলেন। লোভ, মোহ, মিথ্যা প্রতারণা তার সহায়ক হ'ল। অজ্ঞাত ভয়ে ভীতমন দম্ভের পরামর্শ চাইলে দম্ভতাকে'' সুবলে স্বাধীন'' হয়ে রাজ্যশাসন করতে বলে। দম্ভের প্ররোচনায় মন বিভুকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। রাজ্যে দেখা দিল অরাজকতা। মনের অত্যাচারের কথা শুনে বিভু বিবেককে পাঠালেন। লোভ, মোহ, ক্রোধ, আশা, অহঙ্কার সকলের কথা শুনে পরমজ্ঞানী বিবেক বিবেচনা করলেন, কাম ক্রোধ লোভআদি সকলেই অপরাধী

কিন্তু মন অনর্থের মূল।

সুতরাং মনকে শাসন করলে আর কেউ এ সংসারে যন্ত্রণা পাবে না। অতএব মনকে দুঃখরূপ দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল।

দ্বারকানাথ অধিকারী ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। সুতরাং গুরু-কবির প্রভাব অস্বীকার করা দ্বারকানাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঈশ্বরগুপ্তের বোধেন্দুবিকাসের

যত তিনি লোভ, মোহ, কাম- ক্রোধ, দম্ভ অহঙ্কার প্রভৃতি মানবিক বৃত্তিগুলির উপর ব্যঙ্গ্য আরোপ করে' মনের রাজত্ব' নামক কবিতাটি রচনা করেছেন। রিপুর নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে স্বেচ্ছাচারী হলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এই নীতিই যেন পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন কবিতাটির মাধ্যমে। কবিতাটির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। কোথাও অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। নেই যুক্তিতর্কের জারিজুরি। কোথাও ত্রিপদী কোথাও লঘু ত্রিপদী কোথাও দীর্ঘত্রিপদী কোথাও ৮+৬ এর চোদ্দমাত্রা বিশিষ্ট অমিত্রবৃত্ত ছন্দে কবিতাটি রচিত।

সুধীরঞ্জনের তৃতীয় অধ্যায়ে 'ভারতবর্ষের বিলাপ' নামে একটি রূপক কবিতা আছে। এই কবিতাটিতে ভারতবর্ষকে ভারতজননী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এবং ভারতবর্ষের অধঃপতনের জন্য ভারত রূপ জননীর বিলাপ এই কবিতার বিষয়।

বিদেশীয় রাজা আসি আমার হৃদয় বাসি
পুত্র সবে করি পরাজয়।
হরিয়া সকলধন করিলেক বিসর্জন
বেদ বিদ্যা আদি ধর্ম্মচয়।
ঘর নষ্ট পুত্রচয় নাহি ভাবে ধর্ম্মভয়
অতিশয় দীনবল সবে।
আমি ভাসি আঁখিজলে তারা কিছু নাহি বলে
এই দুঃখ কবে দূর হবে।

'সত্যবতীর সহিত পাখিনীর বিবাদ' এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় কবিতা। পূর্বকালে বিশুপুরে বিশেষুর নামে এক পরম কারুণিক ও ন্যায়বান অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর ইন্দ্রাবতী নামে পরম রূপবতী এক মহিষীর গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। রাজা কুমার ও কুমারীর মুখরূপচন্দ্র সন্দর্শনে

সংতুষ্ট হয়ে দুহিতার নাম সত্যবতী ও পুত্রের নাম ধর্মরাজ রাখলেন। ধর্মরাজ উপযুক্ত হলে বিশ্বেশ্বর স্বীয় সন্তানের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে প্রচ্ছন্ন বেশে বনবাসী হলেন। ধর্মরাজ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রজাপালন করবার কালে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হল। বিশ্বপুরের অন্তঃপাতি নিরয় নামে এক নগরে পাতক নামে এক উত্তমর্ন বাসকরত। তার পত্নী পাপিনীর গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র জন্মে। পুত্রেরা বয়স্ক হলে স্ব স্ব পরাক্রম প্রভাবে আপনাদের জয় পদবী বিস্তার এবং ধর্মরাজের রাজ্যলুণ্ঠন, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি অশেষ অনিষ্ট করতে লাগল। রাজা পাতকের সঙ্গে যুদ্ধ করাই শ্রেয়বোধ করলেন। কিন্তু যখন সেনাপতির প্রতি সৈন্য সংগ্রহের আদেশ করলেন তখন দেখলেন যে অনেকেই প্রতিপক্ষের পক্ষ হয়ে দুর্বাক্য বলছে। নৃপতি হতাশ্বাসে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সন্ন্যাসির বেশে নিজাবাস পরিত্যাগ পূর্বক সুখদার সঙ্গে বিপিনবাসী হলেন। সত্যবতীও ভ্রাতার দুরবস্থা শ্রবণে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে রোদন বদনে ধর্মান্বেষণে গমন করলেন এবং পাপিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল ও তাদের কথোপকথন হতে লাগল। পাপিনী ও সত্যবতী - দুটি কাল্পনিক চরিত্রের বিবাদ এবং কথোপকথনের সাহায্যে কবি দীর্ঘ কাহিনী রচনা করেছেন। বর্তমানদেশে, পাপের প্রসার ঘটেছে ও তার অবসানকল্পে সত্যবতী ও ধর্মরাজের আগমন অবশ্যই বাঞ্ছনীয় - তাই কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতাটি ১৬ই এবং ১৭ই মার্চ ১৮৫৩ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল ও কালেজীয় যুদ্ধে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় কবিতা দ্বৈষ এবং ক্রোধের সহিত সুশীলের বিবাদসূত্রে দ্বেষের প্রতি প্রকৃতি সতীর উপদেশ এবং চতুর্থ কবিতার নাম কৃষ্ণনগর কালেজের রোদন ও হিন্দু কালেজের সহিত কথোপকথন। কবিতাদুটি আ সাধারণ।

সুধীররঞ্জন বইতে 'পরদার' নামে একটি দীর্ঘ রূপকরীতিতে রচিত কবিতা আছে। পরদার নামে রানীর তিন সহচরী - কুমতি, গঞ্জনা ও সঙ্কোচিনী। পরদার লোভের বশবর্তী হয়ে সেনাসজ্জা করে। পথে জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে অজ্ঞানের সাক্ষাৎ ঘটে। ধীরেধীরে অজ্ঞানের মনে

জ্ঞানের উদয় হয়। তখন তারা পরদারের সভায় উপস্থিত হয়। পরদার জ্ঞানচক্ষুতে তার সভায় উপস্থিত হতে দেখে সভা ছেড়ে পলায়ন করে।

সুধীরঞ্জনের কবিতাগুলি নীতিমূলক। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য তিনি কবিতারচনা করেন নি। কবি হিসেবে তিনি স্মরণীয় নন। তবে ঐতিহাসিক কারণে তাকে স্মরণ করা যায়। তাঁর কবিতার ধারণাটা ছিল ঈশ্বরগুপ্তের মতো, ব্যঙ্গপ্রিয়তায় নয়, নৈতিক এবং পারমার্থিক কবিতায় দুজনের মিল ছিল। এছাড়া যে রূপকরীতিতে দ্বারকানাথ কবিতা লিখেছিলেন সেই রীতি বাংলা-সাহিত্যে প্রথম ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে দ্বারকানাথ ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য।

সুধীরঞ্জনের কবিতা ছাড়াও দ্বারকানাথ অধিকারীর আরও কয়েকটি কবিতায় রূপক-রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'সতীত্বের আক্ষেপোক্তি' - এখানে সতীত্বকে নারী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভারতের বর্তমান দুরবস্থার জন্য সতীত্ব অরণ্যে ক্রন্দন করছে। এই কবিতার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু একটি মূল্যবান তথ্য আছে -

- নবীন যুবকগণে স্বদেশী যুবতীজনে
বিবাহের পূর্বে চাহে তায়।

বিবাহের পূর্বে নারীপুরুষের পরিচয় - কোর্টশিপের ভিত্তিভূমি যে সেকালের সমাজ পটভূমিতে ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর 'বর্ণমালার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথন' কবিতাটিও রূপকরীতিতে রচিত। আর একটি কবিতা 'সরস্বতীর খেদ ও দ্বিতীয় বরপুত্রের সহিত কথোপকথন' দীর্ঘত্রিপদীতে রচিত। সরস্বতী প্রথম পুত্রকে বরদান করে নিজ ঘরে ফিরে গেলে তার দ্বিতীয় বরপুত্রের জন্ম মনস্তাপের উদয় হয়। তিনি খেদ প্রকাশ করতে লাগলে কল্পনাদেবী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দ্বিতীয় বরপুত্রের সন্ধানে নির্গত হন। অনেকদেশ ভ্রমণ করে শেষে সরস্বতীকূলে কবিবরের সাক্ষাৎ পান, দেবী সরস্বতী তার সান্নিধ্যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন।

মাদকমঙ্গল (১২৭৪) : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কবি বিহারীলালের ভাবশিষ্য। তিনি ১২৭৪ সালে দ্বিতীয়বার দুরারোগ্য অপস্মার রোগে আক্রান্ত হন। এই সময়ে নবোদ্ভিন্ন নামে আখ্যায়িকা ও 'মাদকমঙ্গল' রূপক কবিতা রচনা করেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, '' রূপক কবিতা মাদকমঙ্গল ১২৭৪ সালে লেখা।'' ১

সুরাপানের অপকারিতা সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ঙ্গম ছিল। এই সুরারই জয় ঘোষণা করে তিনি উক্ত কাব্যটি রচনা করেছেন। তাঁর 'মাদকমঙ্গলের' বিষয় বস্তুতে নতুনত্ব আছে। যমরাজের সভায় ব্যাধি, বিগ্রহ, কাম্যা, দুর্ভিক্ষ ও মাদকতা নিজ নিজ গুণাবলী প্রকাশ করে পরস্পরের চাইতে নিজেকে শক্তিমত্তায় বলশালী বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বিগ্রহ নিজ বলবত্তা প্রকাশ করে বলে, —

'' ছিল নর শূন্য কর, অসি ধনুরশর
মম উপদেশে ধরে,
তার নিধন সাধন না দেখে তেমন
কামান সৃজিছি পরে।
যার অনল তুণ্ডে ভৈরব গর্জনে
গর্ব্ব খর্ব্ব অশনির
... ...
কোথা শানিত কৃপাণ বিশাল কামান
কোথা তাপ, জ্বালা, জ্বর।
দেখ বিচারিয়া মনে চরিত ভুবনে
কে অধিক বলধর ?

১। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ - ৪১৪।

দুর্ভিক্ষ দম্ভভরে বলে, তার প্রভাবে –

'' নগ্নকায় ধায় যেন কুলবতীগণ
নরজাতি করে অভিমান
দয়াবান্ নাহি জীবে তাহার সমান
সে গর্ব্ব করেছি আমি ক্ষয়
পুত্রমুখগত গ্রাস মাতা কাড়ি লয়
কেহ হয়ে ক্ষুধায় বিকল
শিশু সুতে বধিল আছাড়ি ধরাতল
কেহ অতি হতাশার ভরে
জলতে নদীতে ফেলি বাঁধ দিন পরে
কেহ মুষ্টি তণ্ডুলের দায়
বিক্রয় করিল স্বীয় প্রেয়সী তনয়ায় ।''

শেষ পর্যন্ত নিজগুণ প্রকাশে মাদকতাই জয় লাভ করে । কেননা নরের আত্মাকে বিনাশ করার ক্ষমতা আছে মাদকতার । যথা –

ব্যাধি বাত্যা বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ যত জন
সাধে সবে দেহের পতন
আত্মায় বধিতে নরে কে আর প্রভাব ধরে
আমি মাত্র আছি একজন
ধর্ম্মের নিধনে সাধি আত্মার নিধন ।

এরপর বিচারক কাল মাদকতার জয় ঘোষণা করে সকল সভাসদকে 'মাদকমঙ্গল' গীত গাইতে বললেন । ব্যাধি, বিগ্রহ, বাত্যা, দুর্ভিক্ষ সকলে মাদকতা দেবীর স্তব শুরু করল ।

'মাদকমঙ্গল' কাব্যে বিশেষ কোন গভীর বক্তব্য নেই। সুরেন্দ্রনাথের একটি কবি প্রত্যয় ছিল। তারই শক্তিতে তিনি নীরস মরুভূমিতেও ফুলফুটিয়েছেন - নীরস বিষয়বস্তু নিয়েও যে কাব্য রচনা সম্ভব সুরেন্দ্রনাথ তার প্রমাণ রেখেছেন। বাত্যা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, বিগ্রহ, মাদকতায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করায় ও ধারাবাহিক একটি কাহিনীতে আশ্রয় করায় কাব্যটি রূপক হয়ে উঠেছে। নতুবা রূপক কাব্য বলার সঙ্গত কোন কারণ কাব্যটিতে দৃষ্ট হয় না। তবে চিন্তাগাঢ় ও দৃঢ়পিনদ্ধ বক্তব্যশালী কবি সুরেন্দ্রনাথের রচনা হিসেবে মাদকমঙ্গল কাব্যের মূল্য বর্জিত হয় না। সুরেন্দ্র-নাথের কবিতা শুধু ভাবময় নয়, তা চিত্রময়। অবাস্তব মনোহর ইঙ্গিত তারই রূপরঙরেখাকে আশ্রয় করে চিত্রময়ী হয়ে উঠেছে। মাদকতার রূপ বর্ণনায় কবি চিত্র এঁকেছেন - ঢুলু ঢুল আঁখি দুটী, ঘূর্ণিত অলসে

উঠিতে কটির বাস খসে

পদ্ম দলগত জল কলেবর ঢলঢল

এলো চুল ভূতল পরশে

সভায় কামিনী হেন উঠিল সরসে।

মাদকতা মনমোহিনী নারীরূপে চিত্রিত হয়েছে। অথবা -

ঢলিতে ঢলিতে হেন বলিতে বলিতে

স্মিতাননা লাগিল হাসিতে

স্বর্গের শোভায় তায় যমালয়

দীপ্তি পায়

হরে মন চকিতে আঁখিতে।

মাদকতার এই মোহিনীরূপ তার মোহময়তা বৃদ্ধি করেছে। কিম্বা -

কুপ্ত কেশরীর প্রায় গর্জিয়া সভায়

উঠিয়া বিগ্রহ কহে —

বস্তুগত রূপকে শব্দগত রূপে অনুবাদ করবার যে শক্তি সেই শক্তিগুণেই তিনি এরূপ চিত্র অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর রূপসন্ধানী দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ তাঁর বাণীসৃষ্টিও তেমনি যথাযথ।

ব্যাধি তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে বলে -

যথা জীব আমি তথা কায়া সহ ছায়া যথা
ভ্রমি বনে, প্রান্তর নগরে
বিশুদ্ধেও সুবিশাল চরে জীব পশুপাল
শুধু যম ঘৃণ্যার তরে।

কবির বাণীসৃষ্টির গুণেই এমন সত্য কথা এত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এই উক্তি পাঠকালে কবির কবিত্ব শক্তিতে চমৎকৃত হতে হয়।

কাব্যমঞ্জরী (১৮৬৮) : বলদেব পালিত

বলদেব পালিতের 'কাব্যমঞ্জরী' কাব্যগ্রন্থটিও অনেকগুলি কবিতার সংকলন। তবে এই সংকলন গ্রন্থের সবগুলি কবিতা রূপক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখেছেন, '' এই কবি কিছু রূপকপ্রিয়। অনেকগুলি কবিতাই এই অলঙ্কারে বিশিষ্ট।'' ২

'কাব্যমঞ্জরী' গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'কবিতার জন্ম' ব্যক্তিগত ভাবে কবির এবং ইতিহাস-গতভাবে বাংলা কাব্যের একটা বিশেষ পরিচয়বাহী কবিতা। কবিতাটি অনেকাংশে রূপকধর্মী। কবি একদিন জাহ্নবীতীরে ভ্রমণকালে এক রোরুদ্যমান নারীর সাক্ষাৎপান। তিনিই 'কবিতাসুন্দরী'। আকাশের চাঁদের সঙ্গে 'মিথ্যার' বিবাহে 'কল্পনা' নামে এক কন্যার জন্ম হয়েছিল। সেই কন্যা

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯, পৃ - ৪২৮।

পতিরূপে বরণ করেন সত্যদেবকে। সত্যদেব মিথ্যা ও অজ্ঞানকে পরাজিত করে সতীরূপে গ্রহণ করেন কল্পনাকে। ' কবিতা' তাঁদেরই কন্যাসন্তান। কিন্তু কল্পনা শিশু কবিতাকে বাল্মীকির তপোবনে ফেলে রেখে গেলে দেবী সরস্বতী সেই শিশুকে বাল্মীকির আশ্রয়ে এনে দেন। যথা -

বাল্যকালে পিতৃসম পালি সে মুনিসত্তম
কবিতা রাখিলা মম নাম।

পরবর্তীতে বাল্মীকি ' কবিতার'সাহায্যে রচনা করলেন মহাকাব্য।

আমারে হৃদয়ে করি রামের চরিতস্মরি
রচিলেন কাব্য অভিরাম।

দেবী সরস্বতী কবিতাকে নবরস শিক্ষা দিলেন, আশীর্বাদ করলেন যার মন যেমন, তাকে তেমনি করেই রসের দীক্ষা দেবার জন্য। কবিতাকে আশ্রয় করে প্রাচীনকালে কালিদাস রচনা করলেন' শকুন্তলম' কাব্য। কিন্তু যবনদের ভারত আক্রমণ কালে ' স্বাধীনতা দেবীর সঙ্গে কবিতা দেবীও' এই দেশত্যাগ করেন। উক্ত কবিতাটিতে মিথ্যা, কল্পনা, সত্য কবিতা প্রভৃতিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে রূপকচেতন করে তুলেছেন কবি। তাঁদের মানবিক ক্রিয়াকলাপে কাব্য সাহিত্যের একটি বিশেষ ইতিহাসের রূপক হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া, তৎকালীন রূপক সাহিত্যের যে একটি বিশেষ ভঙ্গি - নদীতীরে কবির সঙ্গে কল্পনা বা কবিতাদেবীর সাক্ষাৎ এবং তারই সঙ্গে কবির যাত্রা তথা মানসযাত্রা - তারই পরিচয় পাই এই কবিতাটিতে। নদীতীরেই কবি কবিতাদেবীর সাক্ষাৎ পান এবং নদীতীরেই তাকে হারান। ইতিমধ্যে কবিতাদেবী তাঁর নিজস্ব শোক প্রকাশের মাধ্যমে তৎকালীন কাব্যেতিহাসের যে পরিচয় দেন তা মূলত : কবির স্বগতচিন্তার প্রকাশ।

এদিকে থেকে কবিতাটি রূপকধর্মী । কিন্তু আসল রূপক কাব্য নয় । কেননা যান্ত্রিকতা তথা শুধু মাত্র রূপকধর্মী আঙ্গিক সার্থক রূপক কাব্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয় । বাহ্যার্থকে ছাড়িয়ে অন্তরস্থ অর্থের যে প্রাধান্য এ কবিতায় তা পরিলক্ষিত হয় না ।

দ্বিতীয় কবিতা'' স্বীয়া এবং পরকীয়া'' কবিতাটি কবির সুগভীর চিন্তার প্রকাশ । স্বীয়া ও পরকীয়া নায়িকার সম্পর্কে কবির মনে যে অনুভব তারই বাস্তবরূপ যেন এই কবিতাটি । স্বীয়া ও পরকীয়া নায়িকার পরস্পর যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কবি নিজস্ব চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছেন । কবি এই কবিতাটিতে রূপক কাব্যের আঙ্গিক আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন । নিদ্রা যাওয়া এবং নিদ্রাভঙ্গের মাঝে স্বপ্নদর্শন করেছেন কবি,

নিদ্রা দেবী আইলেন নয়ন ভবনে
তাঁর বলে তৃপ্তি - রসে মগ্ন হল মন
অতঃপর দিখিলাম অপূর্ব্ব স্বপন ।

এরপর কবির স্বপ্নের স্বীয়া ও পরকীয়ার রূপদর্শন । কবি এখানেও স্বীয়া ও পরকীয়া দুয়কে এবং তাদের সহচরী, পরিতৃপ্তি , সরলতা, স্নিগ্ধতা প্রভৃতিকে ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন । স্বীয়া পরকীয়া উভয়েই নিজ নিজ প্রতিপত্তির কথা ব্যক্ত করেছে নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী । পরকীয়ার উক্তি —

পরকীয়া নাম মম খ্যাত চরাচর
অবনীতে অবতার চরাইতে নর ।

অন্যপক্ষে স্বকীয়ার পরিচয় -

কামদেবে তুষ্ট হয়ে 'মন' মতিমান
'সুমতি' কুমতি' দুই কন্যা দিলা দান

প্রথমা দেবীর গর্ভে জনম আমার
মুকীয়া বলিয়া নাম জগতে প্রচার ।

কবিতাটিতে বক্তব্যের পুরুভার কোথাও রক্ষিত হয়নি, বরং স্বীয়া নায়িকাকে দিয়ে কবিতাটির শেষাংশে কতকগুলি নীতিবাক্য বলিয়েছেন — '' জীবন যৌবন তব চিরস্থায়ী নয় ।''অথবা -

বিধি বৈধ পরিণয়ে পবিত্র প্রণয়
সাধু জনে জানে তার কত সুখোদয় ।
বিবাহিতা দয়িতার প্রিয় সম্ভাষণে
নির্ম্মল আনন্দ পাত পায় প্রতিক্ষণে ।

কবির নিদ্রাভঙ্গের সাথে সাথে স্বপ্নের শেষ এবং কবিতাটির সমাপ্তি । কিন্তু কেবলমাত্র উক্ত বৈশিষ্ট্যটিই কবিতাটিকে সার্থক রূপক কাব্যের মর্যাদা দিতে পারেনি । কবিতাটি রূপকধর্মী হয়েছে মাত্র ।

তৃতীয় কবিতা '' কামবন'' অনেকাংশে রূপকাত্মক হয়ে উঠেছে । দ্বৈপায়ণ পুত্র শুকদেবের দেশপর্য্যটনের রূপকের আড়ালে আপন চিন্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেন কবি । ঋষিপুত্র নানাদেশ পর্য্যটনের পর' কামবনে' প্রবেশ করেন ।

দেখিয়া অনেক দেশ উপনীত অবশেষ
যেখানে বিরাজে কাম-বন ।

সেখানে বনস্থায়ী লোডের সাক্ষাৎ পান । লোড নামক যক্ষ তাকে বনের শোভাদর্শনে পরিতৃপ্ত করে বনবাসী হতে বলেন । ঋষিপুত্র প্রথম সুবর্ন চম্পক [illegible] -

বনে প্রবেশ করেন। সেখানে,

রাশিরাশি ফুলচয় ভূমিতলে পড়ে রয়
সে সকল কেবল কাঞ্চন,
ধনিক বণিক যত, ঠেলাঠেলি করি কত
কুড়াইছে করিয়া যতন।

কিন্তু যেহেতু ধর্মিষ্ঠ মোক্ষধন সাধনে তৎপর সেকারণে পার্থিবধন তাকে বিচলিত করেনি। তিনি সহাস্যে লোভের অনুরোধ উপেক্ষা করে এসে মানীরাজ্য ও যশোকুঞ্জে গমন করেন। সেখান থেকে প্রমোদ উদ্যান ও যশঃপথ উদ্যান অতিক্রম করে সন্তোষপ্রদেশে উপস্থিত হন।

ত্যজি লোভ অধিকার, আশা নদী হয়ে পার
সন্তোষ প্রদেশে দিয়ারণ।

পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর'' আশাকানন'' ও'' ছায়াময়ী'তে এবং তারও পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' মুক্তপ্রয়াণে' বিভিন্ন রাজ্য প্রয়াণের প্রথাকে গ্রহণ করেছিলেন। যা আমরা প্রথম বলদেব পালিতের'কামবন' কবিতায় দেখতে পাই। লক্ষ্যমান, প্রমোদ অপেক্ষা মোক্ষই যে মানবের প্রধান আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এই বক্তব্যকেই কবি রূপকের আড়ালে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন।

'কাব্যমঞ্জরী' গ্রন্থের অন্যান্য কবিতাগুলিতে যেমন - ক) প্রভাত, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ এবং রজনী, খ) জাগরণ, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, গ) আশা, প্রমোদ ও প্রেম, ঘ) বিদ্যা এবং ধন, ঙ) আলস্য ও পরিশ্রম, চ) কাল ও আশা, ছ) দুঃখ, জ) ঈশ্বরচিন্তা, ঝ) পরিবর্ত, ঞ) তটিনীর প্রতি উক্তি, ট) আকাশের প্রতি, ঠ) চন্দ্রের প্রতি, ড) মেঘের উক্তি, ঢ) গঙ্গার প্রতি – কবি নিছক কাব্য করেছেন যাও

কোথাও তিনি কিম্বদন্তীকে আশ্রয় করেছেন, যেমন ' কাল ও আশা' কবিতাটিতে, কোথাও সভার অনিত্যতার কথা বলেছেন, যেমন' আশা, প্রমোদ ও প্রেম' কিন্তু ' পরিবর্ত' কবিতাদুটিতে, কোথাও তাঁর ভাবনার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, সুগভ চিন্তা ও কল্পনার বিস্তার ঘটেছে অনেকাংশে । নীতি উপদেশ দিতে গিয়ে কবি কোন কোন কবিতায় যেমন'' প্রভাত, মধ্যাহ্ন , প্রদোষ এবং রজনী'' – তে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন । মায়া - নিশা , জ্ঞানারুণ, অবিদ্যা - আঁধার আশাবায়ু , ধৈর্যদিয়া' ইত্যাদি শব্দ উপমেয় উপমানের অভেদ কল্পনায় রূপক হয়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ কবিতাটিকে রূপক করে তোলে নি ।

যেহেতু ' কাব্যমঞ্জরী' রচনাকালে কাব্যশিল্পে 'রূপকের' ব্যবহার ছিল একটা অতি প্রচলিত মূলত রীতি - সেকারণে বলদেব পালিতের প্রথমকাব্যগ্রন্থ কাব্য মঞ্জরীতে একাধিক কবিতা রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে । বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন,'' এই রূপ কাব্য, এ পর্যন্ত কখন অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণিত হয় নাই, হইতে পারেও না । তথাপি সেগুলি সুমধুর এবং সুগাঠ্য হয় । 'কবিতার গুণ' ইত্যভিধেয় [illegible] কাব্যখানি আমাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছে ।'' ৩

'কাব্যমঞ্জরী' কাব্যের কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার করতে হয় । কবি যদিও কবিতার ভাষা ও ভঙ্গীতে ঈশ্বরগুপ্তকেই অনুবর্তন করেছেন তবু প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলিতে কবির স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য নয় । ঈশ্বরগুপ্ত প্রকৃতিকে অবলম্বন করে মানবচরিত্রকেই সামনে এনে দেখিয়েছেন নতুবা প্রকৃতির বর্ণনা কবির পরিহাস রসিকতার ভঙ্গি সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। কিন্তু বলদেব পালিত , রাত্রি আকাশ, দাঁড়ি, চন্দ্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যে কবিতা লিখেছেন তাতে ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গের ভাণ নেই । মূলত : এগুলি বর্ণনামূলক তার সঙ্গে কবির

৩। বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্গদর্শন , পৌষ , ১২৭১ , পৃ - ৪২৮ ।

কবির মুগতচিন্তা এবং অনেক ক্ষেত্রেই শেষে একটু নীতিকথা দিয়ে কবিতা শেষ করেছেন। যেমন -

এক পক্ষ বর্ধমান হও তুমি চাঁদ
অপরে ক্ষীণাঙ্গি হয়ে হও অদর্শন।
... ...
মানুষের জীবন যৌবন গেলে হায়।
ফিরে আর কদাচ না আসে পুনরায়।

'কাব্যমঞ্জরী' কাব্যটি আরেকদিক থেকে প্রণিধানযোগ্য, এই সময়টা ছিল কাহিনীকাব্য বা বক্তব্যপ্রধান কাব্যের যুগ। কবিতা যদি কাহিনী আশ্রিতনা ও হ'ত তবু বক্তব্যের একটা যুক্তি পারম্পর্যকে ছাড়িয়ে নিছক অরূপ অনুভূতিকে কবিতায় মুখ্য করে তুলবার রীতি তখনও গড়ে ওঠেনি। ঈশ্বরগুপ্তের পর রঙ্গলাল মধুসূদনও কাহিনীর আশ্রয়ে রচনা করেছেন কবিতা। বিহারীলালের সারদামঙ্গলের মত ভাবপ্রধান কাব্যও কাহিনীর ক্ষীণ আভাস থেকে মুক্ত নয়। এদিক থেকে বলদেব পালিতের' কাব্যমঞ্জরী' কিছু অধিকার দাবী করে।

যৌবনোদ্যান (১৮৬৮) : রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শনের প্রখ্যাত লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত ''যৌবনোদ্যান'' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। ' সভার সাম্রাজ্য' নামক অসম্পূর্ণ কাব্যের এটি প্রথম খণ্ড। নয় পর্ব সমন্বিত ৮৩ টি স্তবকে সম্পূর্ণ ''যৌবনোদ্যান'' কাব্যে একটি মনোযাত্রার ছবি আছে। চমক, কল্পনা, আশা আর কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একজন সুন্দর পুরুষ সভাব্রত সভার সাম্রাজ্য ভ্রমণের ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। একদিন প্রত্যূষে সুখ সরোবর তীরে'' মেঘরাশি দুইপাশে ফেলি বেগে ভ্রমেণ পবন।" ইত্যাদি

একদিন প্রত্যূষে সুখসরোবর তীরে বসন্তের সাথীতে পুরুষ বরটি সংসার ভ্রমণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বসন্ত জানান যৌবনোদ্যান ভয় শূন্য নয়। চারিদিকে প্রলোভন মায়াজাল বেষ্টন করে আছে। তার ধৈর্য্য, যত্ন, সাহস ও সুমতিকে সঙ্গে নিয়ে ধর্ম্মকে মাথায় রেখে অগ্রসর হলে সংসারযাত্রা সুগম হবে। এরপর 'যেমতি সলিল বিন্দু সলিলে মিলায়' তেমনি উক্ত শক্তি চারিটি যুবকের অঙ্গে মিলিয়ে গেল। এবং এই সখীদের সহায়তায় নানা প্রলোভন জয় করে যুবাপুরুষ সংসার রাজ্যে অগ্রসর হলেন। এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

'যৌবনোদ্যান' কাব্যরচনার পূর্ব পর্যন্ত কাব্যগুলিতে আমরা রূপক রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করতে পারি, কিন্তু যৌবনোদ্যান অনেকাংশেই রূপক হয়ে উঠেছে। মনে হয় কবি যদি কাব্যটিকে শেষ করতে পারতেন তবে আলোচ্য কাব্যটি প্রকৃত রূপক কাব্যের মর্যাদা পেতে পারত। সত্যব্রতের সংসার রাজ্যে ভ্রমণে প্রলোভনের রাজত্বে প্রবেশ করে তার থেকে উদ্ধার লাভ এই কাহিনীর অন্তরালে কবি ধর্মাধর্মের জয় পরাজয়ের নীতি প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন। ব্যঞ্জার্থ ও গূঢ়ার্থ সমান্তরাল ভাবে একাব্যে প্রবাহিত হয়েছে। মনোযাত্রার চিত্রও স্পষ্ট।

(ক) সংসার ভ্রমণে বিদ্যাটবী পথে যাব মনের বাসনা --(৩৪ নং স্তবক।)

(খ) পশ্চিমে প্রস্থান ধীরে কর ধর্মে স্মরি বিদ্যাটবী পথে যদি যাইবে সংসারে।

(৮৪ নং স্তবক)

(গ) 'মেঘরাশি দুইপাশে ফেলি বেগে ভ্রমণে গমন।''

ইত্যাদি পংক্তিগুলিতে যাত্রার চিত্র স্পষ্ট।

আবার অর্থ, লোভ ইত্যাদিতে রূপ আরোপ করে অর্থদেব, লোভ মন্ত্রিবর এরূপ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এক্ষেত্রে 'বোধোদ্বিকাসে'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি যে বৈশিষ্ট্য এ কাব্যে স্পষ্ট তাহল পরিকল্পনাগত সৌন্দর্য। এ কাব্য পড়তে পড়তে মনে হয় কবি পাশ্চাত্য রূপকরীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। স্থাপত্য সৌকর্য তাঁর কাব্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তিনি ছত্রে ছত্রে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন।

যেমন : - (ক) নমিলা বসন্তপদে শান্ত সত্যব্রত
প্রত্যূষে কুসুম যেন রবির চরণে
(২০নং স্তবক)

(খ) বিশাল চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে মনে
সাগর সলিলে যথা তরঙ্গ নিকর ।
(২০ নং স্তবক)

(গ) জিনিয়া তুষার দুখ শ্বেত কলেবর ।
(৬৭ নং স্তবক)

(ঘ) দেবদারু জিনি উরু –
(২৬ স্তবক)

(ঙ) সৌদামিনী সূর্য জিনি ভেদি যেন ঘনে ।
(৮০ নং স্তবক)

ইত্যাদি অলংকার তাঁর রচনা উৎকর্ষের পরিচয় দেয় । ''গোটান পাকান যাজ''- এর ন্যায় অতি চলনশীল শব্দও তিনি সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন । আবার কোন কোন স্তবক পুরোপুরি মাইকেলের রীতিতে রচিত । যেমন ১৭ নং স্তবক । গুঞ্জরিয়া, আলিঙ্গিয়া ইত্যাদি নামধাতু ও মাইকেলী রীতিকে গ্রহণ করেছেন । আবার (কথ কথ পথ পথ ঘ) শেক্সপীয়রের এই রীতি গ্রহণ করে তিনি পংক্তি বিন্যাস করেছেন । মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র কাব্যটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ইহাতে অলংকার বিশেষের আড়ম্বর অনেক আছে এবং রচনা চাতুর্য্যও স্থানে স্থানে প্রদীপ্ত বোধ হয় । অধিকন্তু পদ্যের সারল্য ও সম্মার্জিত ভাও লক্ষ্য হয় ।''[৪]

তাঁর রচিত 'কাব্যকলাপ' বই এর অন্তর্গত 'কাব্যের বাগান' কবিতাটিও রূপকাত্মক । কাব্যের উপর ফুলের বাগানের রূপক আরোপ করেছেন সদ্ভাব কুসুম ,

---

৪। রাজেন্দ্রলাল মিত্র : রহস্য - সন্দর্ভ ৫ম পর্ব্ব ৫ ম খণ্ড ।

ভাবুকভ্রমর , অনুপ্রাসপত্র, সুভাষালতিকা, কুসুমসমক, অপূর্ব আনন্দফল ইত্যাদি রূপক অলংকার ব্যবহার করে কাব্য বাগানের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত করেছেন । কোথাও মালারূপক ব্যবহার করেছেন । যেমন -' অনুপ্রাস পত্র ঝোলে যেন মরকত । শাখাপ্রশাখা পত্রে পুষ্পে বৃত্তে উপবৃত্তে কেশরে রেণুতে তরু যেমন সজ্জিত হয়ে ওঠে, তেমনি যমকে অনুপ্রাসে, রসে ধ্বনিতে, ভাষায়, অলংকারে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটে । প্রস্ফুটিত পুষ্প মধুদানে চঞ্চলভ্রমরকে আকৃষ্ট করে, সু-কাব্য হতেও ভ্রমররূপ ভাবুক কবি যে রস আস্বাদন করে তা ভূতলে অনুলনীয় ।

রূপক অলংকারের সমহারে, শব্দপ্রয়োগ নৈপুণ্যে এবং সহজভাষার গুণে কবিতাটি সুখপাঠ্য হয়েছে । ৮ + ৬ এর মিত্রাক্ষরে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতাটি রচিত হয়েছে । কাব্যের বাগান' সম্পর্কে আরও দু একটি কথা বলা যেতে পারে । মার্কিন সমালোচক Win Salt - বলেছেন, '' Romantic Poems tend to be about Romantic Imagination "৫ তাঁর মতে শেলীর'' Ode to the West wind " এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর Prelude - কবিতায় কাব্যকল্পনাই হয়ে উঠেছে কবিতার বিষয়বস্তু । এমনকি, কেলেরিজ্‌জ এর "Ancient Mariner ... may be read as a poem about imaginations " - ৬ ''রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অনেক কবিতারই বিষয় কবিতা । কবিতা কী , কবি কল্পনার স্বভাব কেমন, কাব্যসৃষ্টিতে দেবীপ্রেরণার ভূমিকা , প্রকৃত জগত ও কাব্যকল্পনার সম্পর্ক, এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন রোমান্টিক কবিদের অনেকেই । তত্ত্বালোচনায় ভরা প্রবন্ধে নয়, কবিতায় - শেলী এবং কীটস্‌ , কেলেরিজ্‌জ এবং রবীন্দ্রনাথ । আর বোদলেয়ারের পর থেকে কবিতায় যে আধুনিক যুগের আরম্ভ তার তো কথাই নেই'। ৭

William K. Winsatt and Cleanth Brooks: Literary Criticism : A short History, Indian , ed L 1964 , Page 404.

ঐ

অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় , ২য় সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃ - ১৯৫ ।

জার্মান কবি রিল্কের 'Sonnets to Orpheus' এবং বুদ্ধদেব বসুর ''যে আঁধার আলোর অধিক'' গ্রন্থগুলির কবিতা এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ''কাব্যের বাগান'' কবিতাটিকে বাংলাকাব্যের ইতিহাসে এই বিশেষ রোমান্টিক লক্ষণের পূর্বসূরী বলা যায়। কবিতাটি কবিতা হিসেবে তত উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু কবিতাকেই কবিতার বিষয় করায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্যের বাগান' একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে।

'নাট্যসম্ভব' ও 'ভারতসান্ত্বনা' : রাজকৃষ্ণ রায়

একগুচ্ছ রূপক পর্যায়ে আসে রাজকৃষ্ণ রায় রচিত 'নাট্যসম্ভব' ও 'ভারত-সান্ত্বনার কথা'। 'নাট্যসম্ভব' রচনাটির প্রকাশকাল ১২৮৩ সাল। রচনাটিকে কবি 'উপরূপক' আখ্যা দিয়েছেন। রচনাটি নাটকাকারে রচিত। এখানে তিনটি পুরুষ চরিত্র আছে —

ইন্দ্র — অমরাবতীর অধীশ্বর

ভরত — সঙ্গীতাচার্য্য ঋষি

ভদ্র — ভরতের শিষ্য।

তাছাড়া রয়েছে স্ত্রী চরিত্র —

সরস্বতী — বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ও অপূর্ব্ব রমনীগণ।

নাটকের মত পাঁচটি দৃশ্যান্তর রয়েছে।

'নাট্যসম্ভবের' — বিষয়বস্তু - অমরাবতীর অধীশ্বর ইন্দ্র, শচীর হরণে শোকতপ্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় ভরত ঋষি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন এবং সরস্বতীদেবীর পূজোর্চনা করেন। সরস্বতী দেবীর অনুগ্রহে ভরত তাঁর শিষ্য ভদ্রের

সাহচর্যে এবং অপূর্ব রমনীগণের সহায়তায় ইন্দ্রকে একটি নাটক পরিদর্শন করাণ। নাটক দেখে ইন্দ্রের শোকলুপ্ত হয়। সকলে মিলে সরস্বতী দেবীর জয় ঘোষণা করেন। প্রকৃত নাটক দর্শকের মনে পরিশুদ্ধি এনে দেয় দুঃখ সন্তপ্ত মনেও আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয় – এই তত্ত্বকেই যেন রাজকৃষ্ণ রায় আলোচ্য রচনায় পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তবে রূপকাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কসঞ্চিত রূপকের মালা বা বাচ্যার্থপ্রাধান্যের দ্বৈতক্রিয়া এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

রাজকৃষ্ণ রায়ের আরেকটি রচনা' ভারত - সান্ত্বনা ' র প্রকাশ কাল ১২৮৬ সাল। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' সাহিত্যসাধক ' চরিতমালায় রচনাটি সম্পর্কে লিখেছেন, কাব্যটি '' কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক।' সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তিত হয় - এইভাবকে পরিস্ফুট করতে কবি' ভারত-সান্ত্বনা' দৃশ্যরূপকের পরিকল্পনা করেছেন। রচনা রম্ভের শুরুতে বলেছেন,'' সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।'' এ কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাব্যারম্ভের প্রথমেই ভূমিকা দিয়েছেন,'' ভারতের শেষ নরপতি পৃথুরায় যবনগণ কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলে ভারত পরাধীন হয়। সেই পরাধীন অবস্থার শতবর্ষব্যাপী সময়ের ভারত লইয়া এই ভারত -সান্ত্বনা'' রচিত হইল।''

তিন অঙ্কে রূপকটি সমাপ্ত। বিষয়বস্তু - পরাধীন ভারতমাতা নিজ দুঃখে রোদন করতে করতে মূর্ছা গেলেন। দুইজন ব্রহ্মার দূত এসে তাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে এল। ব্রহ্মা তাকে অভয় দান করে সাহস ও ঐক্য নামে দুই শক্তিকে ভারতভূমিতে পাঠালেন। তাঁরা ভারতসন্তানদের জাগ্রত করে গাত্রোত্থান করতে বলল। ভারতসন্তানেরা নিজেদের এপটি বুঝতে পারল। সাহস ও ঐক্য তাদের ' মাভৈঃ' বানীর সাহায্যে আশ্বস্ত করে অন্তর্ধান করল।

নাটকটি পাঠে অনুধাবন করা যায় পরাধীনতার গ্লানি কবির মনে ব্যাথার সৃষ্টি করেছিল। ভারতবাসীর দুর্বলতা, তার অনৈক্য মনোভাব, অকারণ ভীতি কবির মনকে করেছিল পীড়িত। একজন স্বদেশ প্রেমিক হিসেবে ভারতবাসীর মনে ঐক্য ও সাহস আনবার জন্য তিনি এই রূপক নাট্যকাব্যটি লিখেছেন। ভারতদেশ, সাহস ও ঐক্য দুই শক্তির উপর চেতনত্ব আরোপ করায় চরিত্রগুলি রূপক অলঙ্কারে পর্যবসিত হয়েছে। রূপকের আর কোনোবৈশিষ্ট্য এতে লক্ষ্য করা যায় না। তবে একথা সত্য ''ভারত - সাংত্না'' নাটকাকারে লেখা হলেও এটি ঠিক নাটক নয়। নাটকাকারে কাব্য। এই' কবিতাত্মক দৃশ্যরূপকে' দুটি গীত আছে। একটি নাটকের প্রথমে ভারত মাতার কণ্ঠে '' এই কি লিখিলে, বিধি, কপালে আমার হে,'' অপরটি ২য় দৃশ্যে ঘুমি নারদের কণ্ঠে'' কেন গো ভারত: করিছ রোদন '' ইত্যাদি। এছাড়া ভারতমাতার সংলাপে —

'শতদল - দলে যথা টলমলে নীর,
বিধির নিয়তি চঞ্চ তেমতি অস্থির।
দিন গতে নিশা আসে - নিশাগতে দিন,
সুখ দুঃখ সেইরূপ নিয়তি অধীন।'

গীতিসুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

উদাসিনী : অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী

অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী রচিত' উদাসিনী' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি সে যুগে বেশ সমাদর লাভ করেছিল। লেখক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '' আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসাধারণ উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোন বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ড কাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসাধারণ ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র যত্ন ছিল না। ছুট ছিন্ন পাতে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। 'উদাসিনী' নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার' বঙ্গদর্শনে' যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা জানেও না।'' ১

'উদাসিনী' কাব্যটি রূপককাব্য পর্যায়ের আলোচনায় বিশেষ উল্লেখ্য। কারণ এই কাব্যটি আখ্যান কাব্যের মত সুরেন্দ্র সরালার কাহিনীকে কেন্দ্র করে কাব্য পরিণতি লাভ করেছে কিন্তু অনেকাংশেই, বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ ভাবেই রূপক প্রথাবর্জিত। রূপক প্রথাকে অস্বীকার করে অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে রোমান্টিসিজমের সুর আনয়ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, '' তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িকা - কাব্য ও গাথা - কবিতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।'' ২

'উদাসিনীর' কাহিনীটি এরূপ – এক অমাবস্যা রাত্রিতে জটিল অরণ্যে এক পথিক পথ হারিয়ে বনদেবীকে আহ্বান জানাল। বনদেবী চারিদিক আলোকিত করে আবির্ভূতা হ'ল। তারা রমনীকণ্ঠের এক্যতান ধ্বনি শুনতে পেয়ে উড়য়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, পৃ - ৭১।

২। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৬২, পৃ - ৩৭০।

পেল এক তরুণী প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিতে উদ্যত। তাদের অনুরোধে সেই তরুণী নারীটি আত্মহত্যা থেকে বিরত হয়ে নিজ জীবনে করুণ কাহিনী শুনাল।

আত্ম হননে ইচ্ছুক নারীটি সরলা - বিদর্ভের রাজ্যচ্যুত রাজা বিজয়ের কন্যা। পিতা - কন্যায় সুরধুনী - তীরে কুটীর বেঁধে অজ্ঞাত বাস করছিল। এমন সময় পিতা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সরলা নির্গত হয় পথ্যের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ক্লান্ত সরলা গঙ্গাতীরে উপবেশন করল এবং গঙ্গার স্নিগ্ধ বাতাসে ঘুমিয়ে পড়ল, এমন সময় এলবান। সরলাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। যুবক সুরেন্দ্র দূর হতে দেখে সরলাকে মৃত্যুমুখ হতে উদ্ধার করল এবং তাকে কুটীরে পৌঁছিয়ে দিল। সুরেন্দ্রকে আশীর্বাদ করে সরলার পিতা দেহত্যাগ করল। সুরেন্দ্র মৃতদেহের সৎকার করে এবং সরলার সঙ্গে অঙ্গুরীয় বিনিময় করে কার্যোপদেশে চলে গেল। সুরেন্দ্র আর ফেরে না দেখে সরলা তার পিতার পূর্ব উপদেশ অনুসারে সে দেশের রাজার কাছে গিয়ে তার পিতার লেখা চিঠিটি দিল। পত্রে তাদের পরিচয় বৃত্তান্ত ছিল। রাজা কিছু না বলে সরলাকে সমাদরে অন্তঃপুরে স্থান দিল। রাজবাড়ীর আদরযত্ন সত্ত্বেও সরলা সুরেন্দ্রর জন্য ব্যাকুল হয়ে রইল।

একদিন অন্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে সরলা ও সখী সুলোচনা আলাপরত। সুলোচনা সরলাকে রাজকুমারের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইল। কিন্তু সরলার মন সুরেন্দ্র - আসক্ত। কিছুক্ষণ পর সুলোচনা অন্যত্র গমন করলে অলক্ষিতে সুরেন্দ্র এসে সরলার সাথে মিলিত হয় এবং রাত্রিশেষের পূর্বেই গোপনে উদ্যান পরিত্যাগ করে।

সরলা ঘরে ফিরে নিদ্রামগ্ন হয় এবং স্বপ্নদর্শন করতে থাকে। এমন সময়

সুলোচনা এসে তাকে জাগায় এবং জানায় সুরেন্দ্র উদ্যান থেকে পালাবার সময় রাজপুত্রের হাতে ধরা পড়েছে এবং শীঘ্রই তার মৃত্যুদণ্ড হবে। সরলা রাজপুত্রের কাছে ছুটে গেল এবং বন্দীকে ছেড়ে দিলে তার পাণিগ্রহণ করতে স্বীকৃত হ'ল। রাজার ছেলের সঙ্গে সরলার বিবাহ স্থির হলে রাণী সরলাকে আসল পরিচয় জানিয়ে তার পিতার পত্র পড়তে দিল। অবশেষে বিবাহ রাত্রি উপস্থিত হল। সুলোচনা সরলাকে গান শুনাতে লাগল।

সরলা উদ্যানে এসে অশোক গাছের গুঁড়িতে সুরেন্দ্রের লেখা কবিতা পড়ে জানতে পারল যে সুরেন্দ্র তার জন্য বিবাগী হয়ে গেছে। সরলা সেই পথ অবলম্বন করতে প্রাচীর ডিঙিয়ে পলায়ন করল। ঘুরতে ঘুরতে এক বনে প্রবেশ করে বুঝতে পারল সুরেন্দ্র এ পথেই গিয়েছে। এবং আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখল কিছু মানুষের হাড় পড়ে আছে আর তার কাছেই আছে ''স্বর্ণময় কৌটা'' ও ''শঙ্কর মূর্তি অঙ্গুরী'' যা সরলা সুরেন্দ্রকে দিয়েছিল। তার ধারণা হল সেগুলি সুরেন্দ্রেরই অস্থি। তাই দুঃখে শোকে সেই হাড়গুলির উপর চিতাগ্নি জ্বালিয়ে সরলা নিজেকে আহুতি দিতে উদ্যত হ'ল। এ সময়ে আপ্তকদের আগমন। সরলার বৃত্তান্ত শুনে বনদেবী তাকে সান্ত্বনা দিলেন। ঝড়বৃষ্টিতে চিতাগ্নি নিভে গেল। তিনজনে স্নান পরিত্যাগ করল।

অষ্টম সর্গে হিমালয় প্রদেশে তিনজন উপস্থিত হল। গোমুখীতে এসে তারা গভীর তপস্যারত এক সন্ন্যাসীকে দেখল। তার মুখের পানে তাকিয়ে সরলা মূর্ছা গেল। বনদেবী সন্ন্যাসীর কাছে সরলাকে রেখে জলপাত্রের সন্ধানে গেল। সন্ন্যাসী সুরেন্দ্র। সে মূর্ছিত সরলার কাছে এসে তাকে চিনতে পেরে আলিঙ্গন করল। মূর্ছা ভাঙলে সরলা তার দেওয়া আংটি দেখতে চাইল। সুরেন্দ্র বলল কিম্পুরুষকাননে এক দস্যু তা অপহরণ করে এবং বাঘের কবলে পড়ে। বনদেবী ও পথিক ফিরে এসে তাদের মিলন দেখে সুখী হল এবং তাদের বিবাহ দিবার আয়োজন করল। দশমসর্গে বনদেবী রতি এবং পথিক মদন হয়ে

বসন্তের পোড়ামাটিতে সুরেন্দ্র - সরলার বিবাহ দিল ।

সুরেন্দ্র সরলার কাহিনী থেকে একটি অর্থ নিষ্কাশন করে নেওয়া যেতে পারে । সরলা প্রেম উদাসিনী, সুরেন্দ্র প্রেমভিখারী । পিতৃমাতৃহীন সরলা রাজারানী না হয়ে, ঐশ্বর্যে মোহিত না হয়ে, যাকে ভালবাসত তাকেই বরণ করে নিয়েছে । এই জন্য সরলাকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে । কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত করেনি । প্রণয়ের কঠিন প্রয়াসই যেন তাদের প্রেমের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে । প্রণয় যতই পীড়িত হয়েছে ততই বল সঞ্চয় করেছেন শেষে প্রণয়েরই জয় ঘোষিত হয়েছে ।

অন্যপথে, কবির সঙ্গে পথপ্রান্তে বনদেবীর সাক্ষাৎ , উভয়ের পথপরিক্রমা, অসহায় নারী সরলার সহিত সাক্ষাৎ, সরলার জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ এবং পরিশেষে এক সুখী পরিবেশে অবস্থান, এরই মাঝে নিদ্রামগ্ন ও নিদ্রাভঙ্গ , রূপক কাব্যের বহিরাঙ্গগত বৈশিষ্ট্যকে ছুঁয়ে যায় । কিন্তু আদিকগত এসকল বৈশিষ্ট্য এসেছে যেন কবিরই কল্পনার সহায়ক হিসেবে, প্রথা হিসেবে নয় । রোমান্টিক সৌন্দর্য ব্যাকুলতা কবিকে প্রেরণা দিয়েছে সৌন্দর্য চারিতার কল্পনা দেবী কবির হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছে কল্পজগতে । সৌন্দর্য স্বপ্নাকুলতার বশবর্তী হয়ে প্রেমসাগরের গভীরে অবগাহন করে কবি নিমগ্ন হয়েছেন একটি একটি মর্মের দ্বার উন্মোচনে । রোমান্টিক পাখায় ভর করে রোমান্টিক কল্পনা আকাশচারী হয়েছে । অথচ অতি কল্পনা বা অতি-রঞ্জনের আলঙ্কারিক ভার কাব্যটির গতি কোথাও রুদ্ধ করেনি ।

রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবের উত্তরে সরলা সুলোচনাকে বলেছে ,

''রাজপুত্র বধূ হব এশীয় ঐশ্বর্যে তব
ছি ছি আর বল না আমায় ।
কি হবে বৈভব লয়ে, কি কাজ ইন্দ্রানী হয়ে
অনন্ত যৌবন কেবা চায় ।
বরঞ্চ ভিখারি তরে নগরের ঘরে ঘরে
ফিরিব গো ভিখারিনী বেশে
বরঞ্চ যোগিনী হয়ে অঙ্গ ভস্মমাখা লয়ে
পর্ণকুটির অরণ্য প্রদেশে । ....''

অনুচ্ছ্বসিত আবেগ আয়াসহীন সাবলীলতায় অগ্রসর হয়েছে । গল্পরসকে ব্যাহত করে নি । এবং কাহিনীটিও অত্যন্ত সরস এবং রোম্যান্টিক কারুণ্যে সুরভিত ।

পিতার মৃত্যুর পর সরলা রাজঅন্তরপুরে স্থান পেলে সুরেন্দ্রের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে । এই ব্যাকুলতায় কারুণ্য স্পষ্ট ।

"ঘোর ভালবাসা - ফাঁদে, পড়িয়ে পরাণ কাঁদে
হুতাশে সঘনে কাঁপে কায় ।
কি করি কোথায় যাই কোথা তার দেখা পাই
ভেবে কিছু না পাই উপায় ।
সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র বলে, ভাসিতাম অশ্রুজলে,
করিতাম অস্ফুট চীৎকার ।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "উদাসিনী" কাব্যকে 'গীতিকাব্য' বলেছেন । 'গীতিকাব্য' কবির স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগ উচ্ছ্বসিত কল্পনার প্রকাশ বা Un premeditative art . 'উদাসিনী' পরিপূর্ণ গীতিকাব্য নয় । সুরেন্দ্র - সরলার কাহিনী আশ্রয়ী অন্যান্য কাব্য । কিন্তু গীতিলক্ষণ বা সুরমূর্ছনা সমস্ত কাব্যটিকে জড়িয়ে রেখেছে । তৃতীয়সর্গে সরলার কণ্ঠে একটি গীত সংযোজন করা হয়েছে । "কাতরে কাতরে আর বিলাপিবি বল,
রে বউ - কথা - কও ।" — গীতটিতে সরলার প্রাণবেদনাই প্রকাশিত । যদিও বিষণ্ণতা গীতিকবির নয়, রোম্যান্টিক কবির বৈশিষ্ট্য তথাপি গীতের সে বৈশিষ্ট্য — সুরের লহরী তুলে অন্তরকে স্পর্শ করা সে বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত নয় গীতটি ?

রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য ছিল কবির ব্যক্তিত্বে । তাই 'অসামান্য উদারতা'র সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে এবং 'প্রাণ ভরে রস' গ্রহণ করাতে কখন বাধা মনে করেন নি । আবার আপাত উদাসীন হওয়া সত্ত্বেও গান ও খণ্ড কাব্য লিখতে তাঁর ক্ষিপ্রতা ছিল অসাধারণ।

আবার তিনি ইংরেজী রোমান্টিক সাহিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের উত্তেজনাকে সঞ্চার করে দিতে পেরেছিলেন। অনেক সমালোচকের মতে পার্নেলের 'দি হারমিট' কাব্যের অনুসরণে অক্ষয় চৌধুরী 'উদাসিনী' গাথাকাব্য লিখেছিলেন। সে যাই হোক, যে কাব্যেরই অনুসরণ করুন না কেন অক্ষয় - চৌধুরী, 'উদাসিনী' কাব্য যে তাঁর রোমান্টিক প্রাণের উচ্ছ্বাসজাত এবং তিনি যে এই স্বভাব - গুণেই তৎকালীন রূপপ্রথার যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুসরণে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', এই তিন গাথাকাব্য রচনা করেছিলেন।

• অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যটি ইংরেজি কোন কাব্যের অনুসরণ সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন পার্নেলের 'দি হারমিট' কাব্যের অনুসরণে 'উদাসিনী' কাব্যটি লেখা। কিন্তু প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ডে লিখেছেন, ''আমরা এ যাবতকাল 'উদাসিনী'র প্রেরণা উৎস পার্নেল লিখিত 'হারমিট' জানিতাম। সম্প্রতি ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ভ্রম নিরাকৃত করিয়াছেন। 'উদাসিনী'র উৎস Oliver Goldsmith (1724 -1778) লিখিত। হারমিট নামক ব্যালাড।''

'নির্বাসিতের বিলাপ' : - শিবনাথ শাস্ত্রী

বাংলা সাহিত্যে যখন ইতঃস্ততভাবে রূপক -কাব্য রচনার প্রয়াস পাচ্ছেন কবিরা সেই সময় একটি অখণ্ড রূপক কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেল - সেটি কবি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ'(১৮৬৮) ।

কবি কাব্যের ভূমিকায় কাব্যের উপলক্ষটি বলে দিয়েছেন, ''প্রায় দুই বৎসর গত হইল একজন ভদ্র সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চিরজীবনের মত নির্বাসিত হ'ন । তাঁহার যাইবার দিন তাঁহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল । সেই উপলক্ষে পুটিকতক পংক্তি লিখিয়া 'সোম প্রকাশে' প্রকাশ করিলাম । ....[১] পরবর্তীতে 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শে ও অন্য বন্ধুদিগের আগ্রহে পুস্তকটি সম্পূর্ণ করে তিনি প্রকাশ করেন ।

কাব্যটি চারটি কাণ্ডে বিভক্ত ।

১ম কাণ্ড – আনন্দধাম দ্বীপ, স্থান - সমুদ্রতট, সময় - গোধূলি ।

২য় কাণ্ড - স্থান কুটীর, সময় সন্ধ্যা ।

৩য় কাণ্ড – (স্বপ্ন)স্থান কুটীর । সময় তৃতীয় প্রহর রজনী ।

৪র্থ কাণ্ড – (স্বপ্ন) স্থান কুটীর । সময় ঊষা ।

কাণ্ডগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথমকাণ্ডে আনন্দধামের সমুদ্রতটে নায়কের মনস্তাপ এবং বায়ুকে দূত করে গৃহে প্রেরণ । দ্বিতীয়কাণ্ডে আশা রমণীর আবির্ভাব । তিনি বন্দীকে দেখালেন মুক্তির উপায় । তৃতীয় ও চতুর্থকাণ্ড স্বপ্নাংশ । স্বপ্নের মধ্যে নায়কের পরিভ্রমণ, পথ প্রদর্শিকা আশা কুহকিনী । মুক্তির আশায় অনিশ্চয়তার উত্তাল সমুদ্র উত্তরণের জন্য নায়ক ও আশারমনীর নৌকারোহণ এবং যাত্রা । চতুর্থকাণ্ডে আশারমনী নায়ককে নিয়ে এক বৃহৎ প্রাসাদের প্রমোদভবনে প্রবেশ করলেন । নায়ক সর্বত্রই সুখভাব দর্শন করতে লাগলেন ।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী : নির্বাসিতের বিলাপ , ভূমিকা ।

পরমুহূর্তেই প্রলয় শুরু হল এবং নায়কের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। নায়কের নিদ্রাভঙ্গে কাব্যটি সমাপ্তি লাভ করল। প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ড সম্পর্কে কবি কোন মন্তব্য করেন নি। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ড সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন, ''স্বপ্নাংশটী একটি ধারাবাহীরূপক''[২] এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আশার সাহায্যে বিষাদসাগর ও বিপদের ক্রটিকা উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্য কিরূপে মনে মনে কল্পিত সুখ ভোগ করে এবং পরে মৃত্যুর বলে সে সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে কিরূপে নিজ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।'[৩] বাস্তবিক তৃতীয় ও চতুর্থকাণ্ডে –নায়কের নিদ্রা ভিন্ন হওয়া, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শন আশার সাহায্যে বিষাদসাগর ও বিপদের ক্রটিকা উত্তীর্ণ হয়ে মনে মনে কল্পিত সুখভোগ এবং সুখভোগের পর স্বপ্ন ভঙ্গ এবং বাস্তবে প্রত্যাবর্তন – রূপকাব্যের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছে। স্বপ্নাংশে মানসিক অভিযাত্রার চিত্রই ফুটে উঠেছে। যেমন তৃতীয় - কাণ্ডের একশত আট থেকে একশত ষোল পৃষ্ঠা জুড়ে গভীর সমুদ্রে তরীপৃষ্ঠে একাকী যুবকের যাত্রা ও পৃথিবী ব্যাপী প্রলয়ের বর্ণনা।

''কি ও দেখ, কাদম্বিনী গভীর বরণ।
আচ্ছাদি দিগন্ত মুখ ব্যাপিয়া গগন
সমুদিল পূর্বদিকে তরুণ তপন
ওই দেখ। লুকাইল বুঝি বা লজ্জায়।
... ...
ছুটিল প্রলয় বাণ প্রলয় গভীর,
গগন কাটিয়া যেন হয় শতচির
ছুটিল অসুর পথে করি হুহুঙ্কার
সাঘাত সাঘাত ধরা যায় যে সংসার।''

চতুর্থকাণ্ডে আশারমনীর সাহায্যে বিষাদসাগর ও বিপদের ক্রটিকা উত্তীর্ণ হয়ে নায়ক উপস্থিত হ'ল সমুদ্রের তীরে এক বিশাল প্রাসাদের প্রমোদভবনে। সেখানে সুখের অন্ত

২। শিবনাথ শাস্ত্রী : রচনা সমগ্র - ১ম খণ্ড নির্বাসিতের বিলাপ। বিজ্ঞাপন।
৩। ঐ

নেই । চারিদিকে সুখবৃষ্টি শোক তাপ সব বিলীন হয়ে যায়, অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠে । কিন্তু হঠাৎ অগ্নিবর্ণে দশদিক প্রজ্বলিত হয়ে উঠল । আর 'অন্তরীক্ষে অগ্নিমাঝে হইল ওঙ্কার ।' এই সুগভীর গম্ভীর হুঙ্কারে 'সমুদ্রমে ভাঙিয়া গেল যুবার স্বপন,

সমুদ্রমে ব্যাকুল হয়ে মেলে দু'নয়ন ।
চেয়ে দেখে, পড়ে আছে কুটীর নয়নে
কোথা দ্বারা কোথা মৃত, স্বপনের সনে ,
সে সকল হইয়াছে এবে অন্তর্ধান ।'

নায়কের স্বপ্ন ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটিও সমাপ্তি লাভ করেছে । কাব্যটির বিশ্লেষণে দেখা গেল রোমান্টিক স্বপ্নই মুখ্যত কাব্যরস সৃষ্টি করেছে । স্বপ্নের ভেতর দিয়ে একটা গন্ধের রোমান্স তৈরী হয়েছে যেন । রোমান্টিসিজমের মৌলশর্ত কল্পনার প্রসারতা এবং সৌন্দর্য - মুগ্ধতা । 'নির্বাসিতের বিলাপ' কাব্যটিতে এ দুটি শর্ত পরিলক্ষিত হওয়ায় কাব্যটি অন্তরঙ্গ ভাবে রোমান্টিক হয়ে উঠেছে । গোধূলি সময়ে আন্দামান দ্বীপের সমুদ্রতটে বসে সমুদ্রকে নায়কের মনে হয়েছে সমব্যথী । অপার সিন্ধু তার দুঃখে ব্যথিত হয়ে যেন 'বারবার তরঙ্গ ভঙ্গে করিছে আঘাতকূলে । (Ode to west wind) . সিন্ধুতরঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়) । দিনান্তে মৃদু সমীরণ দোলাদেয় নায়ক চিত্ত । নায়ক তাকে দূতরূপে কল্পনা করে প্রেরণ করে আপন গৃহে । কামার্ত ব্যক্তি চেতন অচেতনের ভেদ জানে না । সেই কারণে কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষ যেমন ধূম -জ্যোতি সলিল ও মরু দিয়ে সৃষ্ট মেঘকে দূত করেছিল তেমনি এই কাব্যের নায়ক বায়ুকে দূত করেছে । নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনাকালে শিবনাথশাস্ত্রীর মনে মেঘদূতের স্মৃতি বর্তমান ছিল ।

প্রসঙ্গত: স্মরনীয় সে যুগটা তখন পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীন রোমান্স সৃষ্টির যুগ হয়নি । কাব্যের মনে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের আভাস না থাকলে সেকালে রচনা যেন সার্থক হ'ত না । একারণেই কবি ভূমিকায় ব্যাখ্যাটুকু যোজনা করে দিয়েছেন যেন । রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের

প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও 'নির্বাসিতের বিলাপে'র একটা বিশেষ অর্থ নিষ্কাশিত করতেই হয়। অর্থাৎ আশার ছলনায় ভুলে মানুষ কল্পিত সুখ ভোগ করে এবং পরে যুক্তির বলে আশাভঙ্গে নিজ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

একদিকে 'আশা' নামক বিমূর্ততাকে অবয়বত্ব দিয়েছেন, নারীরূপে কল্পনা করেছেন, অন্যদিকে জলধি, কূটীর রবি ইত্যাদি প্রকৃতিবাচক বস্তুর উপর 'সম্বোধন অলঙ্কার' আরোপ করায় উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখা দিয়েছে। রোমান্টিকতা যা মধুসূদনে প্রচ্ছন্ন ছিল কল্পনাকে মাধুকরীরূপে কল্পনা করায় বিহারীলালে সারদা পরিকল্পনায় যে রোমান্টিসিজম প্রখরতা লাভ করেছে তারই পরিচয় আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনায় পাই। আশাকে 'কল্পন' বলে সম্বোধন করায়। তবে কবি শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক কবি থাকতে পারেন নি। ঈশ্বর ব্যাকুলতা তাকে ভক্ত কবিতে পরিণত করেছে। কাব্যের শেষাংশে ভক্ত কবি রোমান্টিক কবিকে অতিক্রম করে গেছে।

''সকল ভোলরে মন। পাপিষ্ঠ হৃদয়।
আর কেন বিড়ম্বনা করহে আশ্রয়।
নরক যন্ত্রণা হইতে পাইবে নিস্তার
ভক্তি যদি সেই পদে থাকে রে তোমার।
... ...
যদি হরি কৃপা করি দিন পদে স্থান।
তবে রে অমল কুল হইবে নির্বাণ।''

''নির্বাসিতের বিলাপ'' কাব্যের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ''নির্বাসনের দণ্ডাদেশটুকু বাস্তব তারপর কল্পনায় যুবকের মানসিক যন্ত্রণা বর্ণনার শেষে ভগবদ্ভক্তিতে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।''

৪। শিবনাথ রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড ১৯৭৬।

শ্রদ্ধেয় ভবতোষ দত্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতীরে' কবিতাটির সঙ্গে 'নির্বাসিতের বিলাপ' কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর 'কাব্যবাণী'তে লিখেছেন, ''রবীন্দ্রনাথের সিন্ধুতীরে কবিতাটির মধ্যে যে ধরণের স্বপ্নলোকের কথা আছে। এও যেন সেইরকম। 'নির্বাসিতের বিলাপে'র রূপক কাহিনী পড়তে গিয়ে সেই পরিবেশ এবং কল্পনাকেই মনে পড়ে। রহস্যময়ী নারীর সঙ্গে উত্তাল সমুদ্রে দিকহীন যাত্রা, ঝড়ে মৃত্যুর ইঙ্গিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে বিশাল প্রাসাদে দুজনের উপস্থিতি, নতুন দেশের নতুন রাজসভায় হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার এবং সেখানে কবির উপস্থিতি — এই বিচিত্ররূপক কল্পনা সেকালের কাব্যে ছিল অভিনব। অবশ্য 'সিন্ধুতীরে'র অবগুণ্ঠিতা নারীর আরোহণে যাত্রা এবং বিজন পরিত্যক্ত প্রাসাদ যতখানি অবাস্তব রহস্যময়তার কুহক সৃষ্টি করে পাঠককে মুগ্ধশ্বাস করে তোলে 'নির্বাসিতের বিলাপে' অবশ্যই সেই কুশলতার পরিচয় নেই।'' [৫]

শ্রদ্ধেয় ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য স্মরণ রেখে বলতে হয় বাস্তবিক রচনায় মুন্সীয়ানার পরিচয় দিতে পারেন নি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় — তিনি যেমন রহস্যময়তার কুহক সৃষ্টি করতে পারেন নি, তেমনি রূপকের দুটি অর্থের সমান্তরাল অবস্থান - কেও বজায় রাখতে পারেন নি। নিরাকার বিষয়কে সাকার করা অনুভূতির বিষয়কে চিত্রিতরূপ প্রত্যক্ষ করে তোলা দুরূহ শিল্পকর্ম — তার জন্য প্রয়োজন রূপ ও সৌন্দর্যে। চেতনা এবং শব্দোপকরণ নিখুঁতভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। ধর্মপ্রাণ শিবনাথ শাস্ত্রীর এসকল গুণের অভাব ছিল। তবে তিনি অত্যন্ত সরল ভঙ্গিতে অনায়াসভাষায় উপমা প্রয়োগ করেছেন। যেমন - জননীর কোলে যেমন শিশু অঘোরে ঘুমায় তেমনি যেন চরাচর বিশ্বেশ প্রকৃতির কোলে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিপ্রতিভা যে পর্যায়েরই হোকনা কেন তাঁর নির্বাসিতের বিলাপ'

---

* সম্ভবতঃ ভুলবশতঃ সিন্ধুতীরে কবিতাটির নাম লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কবিতাটি 'সিন্ধুপারে' (চিত্রাঙ্গদা)।

৫। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত : কাব্যবাণী, ১৯৬৬ পৃঃ - ১৬০।

কাব্যটির সার্থকতা ও মূল্য অনস্বীকার্য। কাব্যটির বিশেষমূল্য সম্পর্কে ভবতোষ দত্ত মহাশয় লিখেছেন 'তবু ঠিক এই ধরণের রোমান্টিক রূপক বাংলাকাব্যে আর দেখা যায় নি। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা জাতীয়তামূলক কাহিনী নয়, এমনকি জোনো একটা পরিণত দর্শনও নয়, শিবনাথ এই কাব্যটির মধ্যে একটা নতুন ধরণের রোমান্স সৃষ্টি করলেন এবং তার মধ্যে কল্পনাকে দিলেন অবাধগতি।''[৬] কেবলমাত্র রোমান্সধর্মী কাব্যরচনার জন্যই নয় - রূপকাব্য রচনায় বসে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর গুপ্তকে অস্বীকার করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর পূর্বে রূপকাব্যের কবিগণের রচনায় ঈশ্বরগুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাশে'র প্রভাব অনস্বীকার্য নয়। দ্বারকানাথ অধিকারীর 'মণীশরঞ্জনে' সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মদকমঞ্চলে' বলদেব পালিতের কাব্যগ্রন্থাবলীতে যে প্রভাব প্রত্যক্ষ শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপে' সে প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। এমনকি ভাষার ছন্দের দিক থেকেও ঈশ্বরগুপ্তের অনুসারী তিনি নয়। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ভবতোষ দত্ত মহাশয়ই বলেছেন''বলা বাহুল্য 'নির্বাসিতের বিলাপে'র কাহিনী রীতি ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে ছিল না। এর ভাষা বা ছন্দের দিক দিয়ে শিবনাথ যে ঈশ্বরগুপ্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বলা যায় না।''[৭] আবার 'নির্বাসিতের বিলাপ' কাব্যের ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন,'বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের বাঁধা অমিত্রাক্ষর, অথবা মধুসূদনের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না। কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহা ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এইজন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।''[৮]

৬। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত : কাব্যবাণী - ১৯৬৬। পৃঃ - ১৫৮।

৭। ঐ

৮। শিবনাথ শাস্ত্রী : রচনাসংগ্রহ ২য় খণ্ড ভূমিকা।

জায়াময়ী পরিণয় : -(১৮৮৯)

শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত শেষ কাব্য গ্রন্থ 'জায়াময়ী পরিণয়' রূপকধর্মী । জন - বুনিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' পাঠে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি রচনার অনুপ্রেরণা পান । আত্মনিবেদন, বিস্মৃতি, বিচ্ছেদ, প্রস্থান, তীর্থযাত্রা, কামপুরী, প্রলোভন ও পরিণয় এই সাত পরিচ্ছেদে কাব্যটি বিভক্ত । কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি এরূপ -- মন্ত্র সরল সুন্দর প্রাণে দেবতার আত্মান মন্ত্রেই ধ্বনিত হয় এবং তাকে আনমনা করে দেয় । মাঝে মাঝে দেবতার জ্যোতির্ময় স্নিগ্ধ মূর্তি অতর্কিতভাবে দর্শন দিয়ে তাকে আকুল করে তুলে । তখন পৃথিবীর সমস্ত রূপ - রস - গন্ধ - স্পর্শ, ভোগ - ঐশ্বর্য সুখ - আরাম তার নিকট নিরর্থ বলে মনে হয় । পরম পুরুষের প্রেমময় মধুর আত্মান শুনবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকে । তারপর কামনা ও সাধনাকে সখী করে জ্যোতির্ময় পুরুষের আবাসস্থান আনন্দ-ধামের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা শুরু হয় । কামনা তার মনে আকাঙ্খা জাগিয়ে রাখে -- সাধনা তাকে পথ দেখায় । পথমধ্যে বিনয় ও শ্রদ্ধা তাদের সখী হয় । নানারকম প্রবৃত্তি তাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে । সাধনা সর্বত্রই ভ্রান্তিকে অপসারিত করে দেয় । শোভনা তাদের সখী হয় । তারপর প্রলোভন রাজার অনুচর অলসের প্ররোচনায় এবং শঠতা ছলনা - মায়ার কুহকে পড়ে কামরাজার হস্তে লাঞ্ছিত হবার পূর্ব - মুহূর্তেই সে সাধনা ও বিবেক-বৈরাগ্য সহায়ের সাহায্যে শত্রুদলকে পরাজিত করিয়া গন্তব্যপথের উদ্দেশ্যে চলে । পথে নিরাশা নদী ও সংশয় কুয়াশা বাধা দিলেও তারা আনন্দধামে পৌঁছায় এবং পবিত্রতা তাদের মর্ত্যের বসন - ভূষণ পরিত্যাগ করে জ্যোতির্ময় করে তুলে । সরলতা ও দীনতার কাছে শিখানাভ করে তারা আলোকের রাজ্যে প্রবেশলাভ করে । জ্যোতির্ময় পুরুষের সঙ্গে রমনীর বিবাহ হয় এবং জ্যোতির্ময়, পুরুষ জ্যোতির আকারে রমনীর ভিতর অবস্থান করতে থাকেন ।

এই তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন এবং মিলন প্রত্যাশায় মানুষ ব্যাকুলতার সঙ্গে কণ্টকিত পথ অতিক্রম করে । মানবহিতৈষণাতে তার চরম সার্থকতা ।

উক্ত তত্ত্বটিকে কবি বিশ্বম্ভর নামক ধনীব্যক্তি ও তার কন্যা জায়াময়ীর কাহিনীর রূপকে সুন্দররূপে রূপ দান করেছেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শিবনাথ শাস্ত্রী বুদ্ধের সমস্ত বাসনা ত্যাগ করে দিন দিন আধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করছিলেন। লোকশিক্ষার বাসনাও অন্তঃস্থ জাগ্রত হয়েছিল। ''বলিতে কি তিনি শিশুশ্রী মাতার মত অবশেষে নিজের কবিত্ব শক্তির গলা টিপিয়ে মারিলেন।''[১]

আধ্যাত্মিকতায় কাব্যটি সমুজ্জ্বল লাভ করেছে। তবে ভাবে ভাষায় ছন্দে কাব্যটির মধ্যে অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। শ্রী হেমলতা দেবী : পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত পৃঃ - ৩৪০।

আশাকানন : ১৮৭৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আশাকানন' ও 'ছায়াময়ী' দুখানি রূপকাব্য যথাক্রমে ১৮৭৬ ও ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রী উমাকালী মুখোপাধ্যায় 'আশাকানন' সম্পর্কে বলেছেন ''আশাকানন একখানি মানবরূপক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে এলিগরি কহে।'' [১]

শ্রী কালিদাস রায় বলেছেন, ''হেমচন্দ্রের একখানি কাব্যের নাম আশাকানন। ইহা একখানি পুরাবৃত্তমূলক কাব্য।'' [২]

আলোচনার পথ বেয়ে আমরা দেখতে পারি 'আশাকানন' কাব্যের রূপকত্ব কোথায়।

প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রেখে তার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা রূপকের অভিপ্রায়। 'আশাকানন' কাব্যেও আমরা দুটি কাহিনীধারা লক্ষ্য করতে পারি। দামোদর নদের সৌন্দর্য দর্শন করতে করতে তার সুন্দর সৈকতে শীতল বায়ুতে কবি নিদ্রামগ্ন হন। তারপর চলে তাঁর মানস - বিচরণ। নিদ্রামগ্ন হওয়া এবং মানসিক অভিযান রূপক কাব্যের আন্তরিক বৈশিষ্ট্য।

''আশাকানন'' কাব্যটি দশটি কল্পনায় বিভক্ত। এবং প্রতিকল্পনায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন বিষয়ের।

প্রথমকল্পনা — আশার মনে আগমন ও পরিচয় ...

কবি দামোদর নদের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে নিদ্রাভিভূত হ'ন। স্বপ্নের প্রমাদে সংসার - ভাবনা ভুলে গিয়ে নবীন প্রদেশে যাত্রা করেন। এখানে আশার সন্ধান পেলেন। আশা তাকে আশাকাননে প্রবেশ করান। কবি দেখলেন বিভিন্ন প্রাণী নানা দিক হতে কর্মক্ষেত্রে-

---

১। শ্রী উমাকালী মুখোপাধ্যায় : হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, ১৩৬০।

২। শ্রী কালিদাস রায় : বঙ্গ - সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড ১৩৬৪।

ভিন্নপথে যাত্রা করলেন।

দ্বিতীয় কল্পনা - কর্মক্ষেত্র। এখানে কবি মানবের প্রবৃত্তি সকলকে অলঙ্কার শোভিত ছ জন প্রহরীরূপে উপস্থিত করেছেন। কেননা 'ব্রহ্মাপ্ত জিনিতে' - শক্তি, অধ্যবসায়, সাহস, ধৈর্য শ্রম ও উৎসাহ মানবিক প্রবৃত্তির সকলই প্রয়োজন। তৃতীয় কল্পনায় - রত্নোদ্যান। কবি দেখলেন সকলেরই উদ্দেশ্য রত্নলাভ, রত্নলাভের আশায় মানুষ স্বার্থপর হয়ে উঠছে। আশার মনে পথ চলতে গিয়ে কবি লক্ষ্য করলেন দুরাকাংখা নামে 'দুরাত্মা পরানী' দুর্দম প্রতাপে ''ডুলাইয়া প্রাণী ফেলয়ে কুপথে। অহি সম্পূর্ণ ছল''। চতুর্থ কল্পনা - যশঃশৈল। আশা কবিকে নিয়ে, যশঃশৈলে আরোহণ করলে কবি অনাদিমধীত শুনতে পেলেন। দেখতে পেলেন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খনা, নীলাবতী ভারবি, শঙ্কর আচার্য সকলেই ধ্যানস্থ।

পঞ্চমকল্পনা - স্নেহ, ভক্তি .... । কর্মক্ষেত্র ও স্নেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্তিনী নদীর উপরিস্থিত সেতু পরিণয়। কবি দেখলেন কেউ প্রফুল্ল চিত্তে, সদাতৃপ্ত মনে শান্ত হৃদয়ে সেতু অনায়াসে পার হয়ে চলেছে, কেউ বা বিষম তরঙ্গে ভাসে। কেউ হয় তলগামী ত্রাসে।'

ষষ্ঠ কল্পনা - প্রণয়োদ্যান .... । এখানে সকলপ্রাণী শান্তি লাভ করে। পুরুষ হয়ে জিতেন্দ্রিয়।

সপ্তম কল্পনা - স্নেহ উপবন .... । মাতৃস্নেহরূপী এক নারী শান্তির বারি সকলকে প্রদান করছেন।

অষ্টমকল্পনা - ব্রহ্ম বন্দনা এবং সরস্বতী অর্চনা ... । কবির বাসনা আশার কানন থেকে ফুল তুলে সরস্বতী বন্দনা করেন।

নবম কল্পনা - বিবেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ - কবি আশার অনুগমন করে বিবেকের সাক্ষাৎ পেলেন। তেজঃপুঞ্জ ধীর গম্ভীরবদন, শ্বেতশ্মশ্রু,। শ্বেতকেশ বিবেকের সান্নিধ্যে জানলেন আশা - মায়াবিনী, আশাকুহকিনী। মানবকে ভুলিয়ে আশা তাকে ভুলপথে চালিত করে। কবি

বিবেকের সঙ্গে আশাকাননের প্রান্তভাগে এসে দেখলেন - আশাদগ্ধ প্রাণী সকলেই ভ্রমণ করছে। শোকমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পেলেন। কবি নিপীড়িত মনমিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। দশমকল্পনা নৈরাশ ক্ষেত্র ... । এখানে কবি দেখলেন সকলেই নিরাশায় জর্জরিত, মৃতবৎ - যেমন প্রকৃতি তেমনি মানুষ। নৈরাশ্য ক্ষেত্রের মধ্যভাগে মরু প্রদেশে এক অনলকুণ্ড। অনলকুণ্ডের কাছে কবি এক হতাশার মূর্ত্তি দর্শন করলেন। কবি হতাশার মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হয়ে ধর্মকে স্থান ত্যাগ করতে বললেন। পরমুহূর্তেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি পুনরায় ধরার আবর্তে পড়ে জটিল স্নেহে নিমজ্জিত হলেন।

নিদ্রাযাওয়া এবং নিদ্রাভঙ্গের মাঝে স্বপ্নদর্শন এবং কবির মানসিক যাত্রা - রূপক কাব্যের এই আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যকে হেমচন্দ্র তাঁর' আশাকানন' কাব্যে গ্রহণ করেছেন। উপরুক্ত উপরিউক্ত কাহিনীর আড়ালে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন একটি দার্শনিক তত্ত্বকে - মানুষ আশার পিছনে এগণঃ ধাবিত হয়ে চলেছে। কেউ লাভ করছে যশ কেউ বা হতাশা।

আশাকাননের কল্পনা সরলও মধুর। এর ভাষা ও ছন্দও সরল ও মধুর। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের মতে'' আজি কালিকার দুর্ব্বোধ্য রূপক কাব্যগুলি পাঠ করিবার সময়েও মধ্যে মধ্যে আমাদের মনে ' আশা- কাননের'ন্যায় রূপক কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার বাসনা উদিত হয়।'' ৩ বাস্তবিক পক্ষে আশাকাননের পরিকল্পনায় রূপকের যান্ত্রিক প্রথাকে যথাযথরূপে গ্রহণ না করে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রতি বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন কবি। তাঁর স্বদেশ চেতনা, ভাবনা রূপকের আচরণ ছাড়াই চতুর্থ কল্পনায় বাস্তবিকের সান্নিধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দামোদর নদের বর্ণনা,

---

৩। শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ : হেমচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ১৮৮২, পৃ - ৫৬।

আশাকাননের বর্ণনা, যশস্বীগণের বর্ণনা, নৈরাশ্যক্ষেত্র, হতাশাক্ষেত্রের বর্ণনায় কবি অনেক বেশী কাব্যময়তাকে আশ্রয় করেছেন। এ প্রসঙ্গে H. M. Dasgupta বলেছেন, " It has been called an allegory. But the conventional of art is too thin to cover the skeleton of the picture. There is no shadowy outline, no hidden thought that can make any meaning dubious or hesitating. "[৪]

৪। H.M.Dasgupta : Studies in Western Influence on nineteeth century Bengali Poetry, (1857 - 1887), Chapter - VI , Page - 48.

ছায়াময়ী (১৮৮০): হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত' ছায়াময়ী' কাব্য' রূপকাব্য' পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ১২৮৬ বঙ্গাব্দে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। কাব্যটি ইতালীর সার্বভৌম কবি দান্তের উদ্দেশ্যে নিবেদিত :

'' তোমারি চরণস্মরণ করিয়া
চলেছি তোমার পথে
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে
ধরি এই মনোরথে।'' ১

' ছায়াময়ী' কবি হেমচন্দ্রের অপার্থিব, অবাস্তব লোকলোকান্তরে কল্পনা বিস্তারের একটি বিশিষ্ট কাব্য। কবি কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, '' ডিভাইন কমেডিয়া' নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি।

সেই মহাকবির নিকট আমি কতদূর ঋণী তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দুটেই বিদিত হইবে। অতঃ বহুল পরিমানে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনা প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।'' ২

১। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থবলী, ১৩৪০, পৃ- ২।

২। ঐ, বিজ্ঞাপন, পৃ- ৩।

কবি মহাকবির নিকট ঋণ স্বীকার করে' বহুল পরিমাণে' কথাটি ব্যবহার করলেও 'ছায়াময়ী' কাব্যালোচনায় মনে হয় এ যেন কবির একান্তই গুরুদেবের কাছে প্রতি বিনয়প্রকাশন। কার্যতঃ মৌলিক বিশিষ্টতার সুন্দর এবং দৃঢ়ভূমি হেমচন্দ্র অনেকাংশেইবজায় রেখেছেন।

ইতালীয় ধর্মাদর্শ প্রণোদিত সার্বভৌম কবি দান্তে তাঁর কাব্যে নরক - শুদ্ধিলোক ও স্বর্গের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে খ্রীষ্টধর্মানুমোদিত মত, উপদেশ ও তত্ত্বকথা প্রকট। অন্যপক্ষে কবি হেমচন্দ্রের পারলৌকিক চিন্তা ভারতীয় আর্যধর্মানুসারী। এই কারণেই' ছায়াময়ী' প্রতীচ্যকাব্যের হুবহু অনুবাদ বা অনুকরণ হয় নি।

দান্তের কাব্যের প্রধানতঃ তিনটি অংশ - নরক, শুদ্ধিলোক এবং স্বর্গ। 'নরক' উক্তকাব্যের অংশমাত্র - এতে সর্গ সংখ্যা - ৩৪। অন্যপক্ষে হেমচন্দ্র 'নরক' কে পূর্ণ কাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। সর্গ সংখ্যা - অত্যন্ত কম। ' পল্লব' নামক সাতটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ কাব্যটি বিন্যস্ত।

উভয় কাব্যে চরিত্র সংখ্যাও সমান নয়। ' কমেডিয়া' তে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ। ভার্জিল যেমন স্থান পেয়েছেন তেমনি আছেন, আবেল, আব্রাহাম, ডেভিড, রাসেল, হোমার, হোরেস, ওভিড ও লুকানে, সক্রেটিস, প্লেটো, হেরাক্লিটাস, জিনো এছাড়া আছেন কলঙ্কিত বিভিন্ন পাপীতাপী নরনারী ও বাজরাজড়া - চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালী দেশের মানুষেরা। 'ছায়াময়ী'তে কলঙ্কিত ... পাপাক্রান্ত অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ কবি দেখিয়েছেন কিন্তু চরিত্র সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সিরাজউদ্দৌল্লা, মৈনাক, শকুনি, বিদ্যা, তারা, নিরো, ক্লিওপেট্রা - এরূপ কয়েকটি চরিত্র স্থান পেয়েছে কবির কল্পিত নরকে।

উভয় উভয় কাব্যের মধ্যে উপাখ্যান সংখ্যারও তারতম্য দেখা যায় । ইতালীয় কবি নরকাংশের প্রায় প্রতিটি সর্গে একটি করে উপাখ্যান সংযোজন করেছেন । ট্রোজান রাজ ভূমোর কাহিনী সংযোজিত হয়েছে সর্গ ত্রিশ - এ । ডার্জিল ও বিয়াত্রিচের কাহিনী আছে সর্গ দুই - এ । মিনাসের কাহিনী সর্গ - পাঁচ - এ । এভাবে প্রতিটি সর্গই এক একটি উপাখ্যানের সংযোজন । অন্যপক্ষে সমগ্র 'ছায়াময়ী' কাব্যে উপাখ্যানের সংখ্যা মূল কাহিনী নিয়ে মাত্র বার তেরোটি । এ-টীন কাইমরের কাহিনী ভারতকলঙ্ক শকুনির কাহিনী ও ধর্মধর যুধিষ্ঠিরের কাহিনী সংযোজিত হয়েছে চতুর্থপল্লবে । কংসের কাহিনী, নীরোর কাহিনী ও সিরাজউদ্দৌলার কাহিনীর উল্লেখ আছে পঞ্চম পল্লবে । ষষ্ঠ পল্লবে মৈনাক ও অনাদিকালের কাহিনী । সপ্তম পল্লব পুরুপত্নী তারা, ভারতের বিদ্যা এবং মিশর রাজীর কাহিনীর সংযোজন । বিষয়বস্তু গ্রহণ, চরিত্রনির্বাচন কিম্বা উপাখ্যান সংযোজন ক্ষেত্রে স্বাধীনচারী হলেও যেমনভাবে উপর 'ডিভাইন কমেডি'র প্রভাব অনস্বীকার্য । কবি 'ছায়াময়ী' কাব্যে যে রূপকরীতি গ্রহণ করেছেন তার উৎস দান্তের 'ডিভাইন কমেডি ।' Dorothy L. Sayers বলেছেন - "The Divine Comedy, is precisely the drama of the soul's choice. It is not a fairy-story but a great Christian allegory". ০

'ছায়াময়ী' কাব্যে প্রথম অনুকরণ রূপকরীতি । মৃত আত্মা ছায়াময়ীর সাহায্যে পাপকারী জীবাত্মাদিগের নানাবিধ নরকয়-ত্রণা এবং বিশুদ্ধেশুই ধর্মরাজের বিচার প্রণালীর বিষয়কে কবি উপস্থিত করেছেন রূপকের সাহায্যে ।

দ্বিতীয়ত : কয়েকটি চরিত্র অঙ্কনে উভয় কবি একই মনোভাব পোষণ করেছেন । বৈতরনীর কান্ডারী হিসেবে 'আচারণ' ও 'চারণ' চরিত্র অঙ্কন করেছেন বিদেশী কবি । বাঙালী কবি প্রতিরূপ চরিত্র এঁকেছেন 'ছায়াময়ীকে' । আবার 'কমেডি'র ভ্রাম্যমান আত্মা চন্দ্রলোকে এসেছে, তেমনি লোকপ্রুতি পিতা এসে পড়েছে 'স্বাতিমন্দিরে ।'

০। Dorothy L.Sayers-এর অনুবাদের ভূমিকা
The Divine Comedy, Hell P.17.

মানুষ নির্বাচনেও উভয় কবির মিল লক্ষ করা যায়। উভয় কবিই তাঁদের কাব্যের নায়ক। দান্তের পথ প্রদর্শক – ভার্জিল ও বিয়াত্রিচে আর হেমচন্দ্রের পরিচালিকা মানসকন্যা ছায়াময়ী। নরকের চিত্র কল্পনায় হেমচন্দ্র বহুলাংশে ইতালীয় কবির ভাবনাকে অনুসরণ করেছেন। "Strange tongues, horrible outcries, utterances of woe, accents of anger, voices shrill and faint,..."[৪] – নরকের এই বীভৎসতার চিত্র ''ছায়াময়ী'' কাব্যের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। চতুর্থ পল্লবে এ চিত্রের প্রকটতা বেশী।

''হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিত কায়
কবন্ধ সদৃশ সব বক্ষ গ্রীবা, শীর্ণবল
পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে পৃষ্ঠভাগে চায়।''

সবকিছু ছাড়িয়া যে মিল উভয় কবির মধ্যে লক্ষ করা যায় তা – পরিভ্রমণের ভাবনা। ইতালীয় কবি 'যাত্রা' দিয়ে (যদিও এযাত্রা ভৌগোলিক নয়, আত্ম-তরীণ মানস যাত্রা) তাঁর নরকাংশ আরম্ভ করেছেন, "Midway in the journey of out life I found myself in a dark wood, for the straight way was lost".[৫]

''ছায়াময়ী'কাব্যেও কন্যাশোকপ্রপ্ত পিতা বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের পর শ্মশানে অবস্থান কালীন ছায়াময়ীর সঙ্গে পুনরায় নরক পরিভ্রমণে যাত্রা করেছে।

''ছায়াময় পবনের কোল হ'তে তবে
দেবী এক তারাপতি নামি এলো তবে।''

এবং ''সঙ্গে লয়ে মর্ত্যবাসী
উঠিয়া আকাশে ঊর্ধ্বে করিল পবন।''

৪। Charles B. singleton কৃত অনুবাদ - The Divine Comedy, Inferno, London, 1971, Canto III, P-27.

৫। Charles S. Singleton কৃত অনুবাদ - The Divine Comedy, Inferno - London, 1971, Canto I, P-31.

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র সব মাহাত্ম্য গভীর পরিকল্পনা ও অনুভূতির যে সৌন্দর্য ও ঐকতান 'ছায়াময়ী' কাব্যে তা অনুপস্থিত। ডিভাইন কমেডির পশ্চাতে মধ্যযুগের ধর্মসংস্কার ও খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের বিরাট চন্দ্রাতপ ছিলো। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় দান্তের কাব্যও নব্য ইটালীয় জাতিকে সংহত গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু 'ছায়াময়ী' কাব্যের পশ্চাতে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের পটভূমি ছিল না।

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' মহাকাব্য। মহাকাব্যের ওজস্বিতা, গভীরতা ও ভাষার সংহতি 'ছায়াময়ী'তে অনুপস্থিত। হেমচন্দ্র আখ্যায়িকা কাব্যের কবি। মহাকাব্যের ভাবের গভীরতা ও শিল্পগত ক্ল্যাসিসিজম তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল না। দান্তের সৃজনী প্রতিভা হেমচন্দ্রে অনুপস্থিত।

তবে একথা সত্য 'ছায়াময়ী'র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও কিছু কম নয়। হেমচন্দ্র প্রথম ও একমাত্র বাঙালী কবি যিনি আর্যধর্মের অননুমোদিত অনন্ত নরককে কাব্যে বিষয়বস্তু করেছেন। আগে পরে কোন বাঙালী কবি নরকের চিত্র অনুপমভাবে অঙ্কন করেন নাই। শশাঙ্ক-মোহন সেন বলেছেন, ''ছায়াময়ীতে সংসারের এক ভয়াবহ নিয়তি চিত্রিত। এই চিত্রে কুত্রাপি অণুমাত্র সান্ত্বনা নাই। জীবরঙ্গভূমে ষড়রিপুর এই অনিবার্য সংগ্রাম এবং ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্খলিত পদ দুর্বল মনুষ্যের জন্য কোন বিভু এই ভীষণ নরক যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন জানিনা। কিন্তু হেমচন্দ্র উহার চিত্র অনুপম ভাবে বাঙালীকে দেখাইয়াছেন।''[৬]

হেমচন্দ্র প্রাচীন বেদপন্থী ঋষিদিগের ন্যায় বিশ্বাস করতেন মানবজীবনে একজীবনের দুঃখকষ্ট অত্যন্ত লঘুবিষয় — কোটী কোটী বার পুনর্জন্ম ও সংসরণে জীবাত্মার মুক্তি। সেকারণে অনন্ত নরকযন্ত্রণার বীভৎসতা দেখাতে তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নি।

৬। শশাঙ্কমোহন সেন : বঙ্গবাণী ২য় খণ্ড : পৃ - ১১।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য কেবলমাত্র নরকের কবি অঙ্কনের বিরোধিতা করে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেছেন, ''পরকালে স্বর্গনিরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার । তিনি পাঠকদিগকে একটির বিভীষিকা দেখাইলেন অপরটির প্রলোভনও তাঁহার দেখান কর্তব্য ছিল'।[৭] রামগতি ন্যায়রত্নের বক্তব্য খণ্ডন করে মন্মথ নাথ ঘোষ লিখেছেন,''হেমচন্দ্র বাইবেলের মতাবলম্বী অনন্ত নরকবাদী কবি দান্তের অমর কাব্যের 'কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে এই কাব্য রচনা করেন, বোধহয় সেইজন্যই স্বর্গ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন নাই ।... দার্শনিকের রাজত্ব যেখানে শেষ, কবির রাজত্ব সেইখানে আরম্ভ । সেইজন্য দার্শনিক যাহা বলিতে পারেন না – কবি তাহাও বলিয়াছেন ।''[৮]

পণ্ডিতবর্গের সমালোচনার অনুবর্তী না হয়ে মূলকাব্য আলোচনায় স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে । 'ছায়াময়ী' অপার্থিব অবাস্তব লোক - লোকান্তরে কল্পনাবিস্তারের কাব্য । 'অতিমানবত্বে'কে অবলম্বন করে কবির কল্পনা সুন্দর বিস্তার লাভ করেছে । ভয়ানক রস বীভৎসরস কে কেন্দ্র করে তাঁর কল্পনা বিস্তার লাভ করেছে । সৌন্দর্যজ্ঞানও তাঁর প্রখর ছিল । সমতা দিয়ে কবিত্ব শোভন বর্ণনায় প্রকৃতিকে তিনি স্মরনীয় করে তুলেছেন ।

''উঠিতে লাগিল তারা আকাশে ছড়ায়ে
এক এক ঝিকিমিকি শুভ্র আলো ঝিকি ঝিকি
ফুটিল নীলিমা কোলে, ফুটে ফুটে যেন দোলে
আকাশের নীলিমার কালিমা ঘুচায়ে ।''

ছায়াময়ী কাব্যে ভাষা ও ছন্দ বৈচিত্র্য ও বিস্তার লাভ করেছে ।কি স্তবক, কি পল্লবান্তরে সংগতি রক্ষায় হেমচন্দ্র তাঁর অন্যান্য কাব্যের তুলনায় পারদর্শী কবি । চিত্র কাব্যের একটি বড় সৌন্দর্য্য । হেমচন্দ্র অনুপ্রাসের সাহায্যে ছোট ছোট চিত্র ফুটিয়েছেন । যেমন

(১) কাঁপি কাঁপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে
ঝিকিঝিকি ।

৭। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ২য় সংস্করণ ১২৯৪ - পৃ - ২৯৬ ।
৮। মন্মথ নাথ ঘোষ : হেমচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ১৮৮২, পৃ - ২৭৩ ।

২। নব রবি নব শশী নূতন ভুবন।

তিনি যথেষ্ট উপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন। প্রায়শই তা এসেছে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় হিসেবে। যে ভাবেই আসুক কবির কাব্যরচনা আসরে তারা অবাঞ্ছিত নয়।

''যথা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখন
কাল অঙ্গে ভাসি কালী সবরূপে দেহ ঢালি
ঘোর পচা গন্ধময় ঘেরি হরি হিরণ্ময়
ঘুরেছিলা মহাকালে করিয়া বেষ্টন।''

ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্য সাধন করেছেন। ত্রিপদীস্তবক গুলিকে বৈচিত্র্য সাধন উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে সাজিয়েছেন। একই প্রকার ছন্দের গ্রাস থেকে কাব্যকে মুক্তি দিতে তাঁর এই সচেতন বৈচিত্র্য সাধন।

হেমচন্দ্র সম্পর্কে জীবেন্দ্র সিংহরায় বলেছেন,''হেমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না, প্রতিভার যাদুস্পর্শে সাহিত্যের স্বর্গবৃষ্টি ঘটানোর কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়। তবু তাঁর কাহিনী গঠনের শক্তি ... অফুরন্ত বর্ণনার কৌশল আমাদের রসচিত্তকে আকর্ষণ করে। হেমচন্দ্র, স্বীকার করতেই হবে, দুর্মর বাঙালী কবি, রসের শাশ্বত মূল্যে না হোক্, ঐতিহাসিক তাৎপর্যে তাঁর সৃষ্টি মূল্যবান।'' [১]

বাস্তবিকই বিষয়বস্তুর নূতনত্ব উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে বাংলা রূপককাব্য ধারায় 'ছায়াময়ী' একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

১। জীবেন্দ্র সিংহরায় : কবিতার সীমানা, ১৯৭৩ পৃঃ - ৬২।

স্বপ্নপ্রয়াণ - (১৮৭৫) : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ

-:ক:-

বাংলা সাহিত্যে 'রূপক কাব্যধারার' শ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্র অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বসাহিত্যের প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কোন ধারারই চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পৌঁছাতে পারেন নাই। কারণ তাঁর প্রতিভা প্রচুর শক্তির অভাব নয়, অভাব ধৈর্যের, জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। এই উদাসীনতা তাঁর ব্যক্তিত্বের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''বসন্তে আমের বোল যেমন আকাশে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া পাতের ডালা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি।''[১] যে উদাসীনতার জন্য 'বাড়িময় পরিত্যক্ত পত্র' ছড়াছড়ি যেত সেই উদাসীনতাই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়েছিল। এই উদাসীনতার বশবর্তী হয়েই তিনি কোনবিষয়েই নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করেন নি। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়ও এ বিষয়ে লিখেছেন, ''আসলকথা হইতেছে যে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রবল নিরাসক্তি ও অসংসারিক ঔদাসিন্য ছিল বলিয়া কোন কাজ তাঁহার মন শিকড় গাড়িয়া বসিত না।''[২]

১৮৪০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় এবং আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সালে তিনি বিবাহ করেন। প্রায় এই সময়ে তিনি 'মেঘদূত' কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের উৎসাহে ও আনুকূল্যে যে হিন্দুমেলা বা হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ তাতে অগ্রণী ছিলেন।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, বাড়ির আবহাওয়া পৃঃ - ৬৮।

২। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস - ২য় খণ্ড তৃঃ সংস্করণ -১৩৬২ পৃঃ - ৪১৭।

এছাড়া তাঁর দীর্ঘজীবনে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯০৫ সাল থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এবং ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি এই উদাসীন, প্রাণখোলা মানুষটি মহাপ্রয়াণ পথে যাত্রা করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘজীবনের রচনাপঞ্জীর বিস্তৃতি বিস্ময় হলেও বিচিত্রতর। তিনি 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' রচনা করেছিলেন। ব্রাহ্মসঙ্গীত ও জাতীয় আন্দোলনের জন্য গানও রচনা করেছিলেন। তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত হয়েছিল ৪ খণ্ডে (১৮৬৬ - ১৮৬৯)। এছাড়া 'রেখাচিত্র, রেখাঙ্কের বর্ণমালা, গণিত, তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর মনীষার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু তাঁর প্রতিভার আসল পরিচয় পাওয়া যায় : 'স্বপ্নপ্রয়াণ'(১৮৭৫) কাব্যে। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, ''যে ভাবাবেগে ভোর হইয়া কবি এই অদ্ভুতীয় কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনে পুনরাবৃত্ত হয় নাই।''[৩]

কেবল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে নয় বাংলা সাহিত্যের আর কোন কবির জীবনেই এরূপটি আর ঘটে নি। এত সৌন্দর্য, এত বৈচিত্র্য, এত বর্ণাঢ্য, এত ঔজ্জ্বল্য, কবে কবে আলোকিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের মতো আর একটিও দীর্ঘ ও সার্থক রূপকাব্য রচিত হয় নি বাংলা সাহিত্যে। এ বিষয়ে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও মতিস্বীকার করেছেন অপ্রত্যক্ষ প্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে ''সেই যে একটি বড়ো জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া পড়িয়া তুলিবার শক্তি সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারিব, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।''[৪]

৩। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড ১৩৬২ পৃঃ - ৪১৮।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি : সাহিত্যের সঙ্গী, পৃঃ - ৭৩।

যা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ তার সৃষ্টি একটিই । 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় সাহিত্যিক মহাকাব্য যেমন একটিই রচিত হয়েছিল তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণ' 'একম অদ্বিতীয়ম" । কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের পূর্বসূরী না থাকলেও সূত্রানুজ আছে – হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড - ১৮৭৫, ২য় খণ্ড ১৮৭৭) ও নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক - (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬) – যদিও অসার্থক রচনা । সুতরাং 'মেঘনাদবধ' কাব্য সাহিত্যের ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন কাব্য নয় । কিন্তু 'স্বপ্নপ্রয়াণ' , সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপখণ্ড । উল্কাপিণ্ড গ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরা উল্কাখণ্ড বললেও অতিশয়োক্তি হয় না ।

– : খ : –

' স্বপ্নপ্রয়াণ' মনোজগতের রূপক । কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যে তাঁর কবিজীবনের আধ্যাত্মিক উৎক্রমের কাহিনী বিবৃত করেছেন । এবং কবিজীবনের বিকাশ, বিবর্তন, পরীক্ষা ও চরিতার্থতার কথা বলতে গিয়ে গ্রহণ করেছেন রূপকের আশ্রয় । আমরা আলোচ্য কাব্যটির রূপকত্ব আলোচনায় দেখব রূপককাব্যের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই উক্তকাব্যটিতে রক্ষিত আছে ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠকদের কাছে তাঁর কাব্যের রূপকর্মটি পরিস্ফুট করবার আগ্রহে প্রভূত যত্ন নিয়েছেন । প্রতিটি সর্গের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যান করবার উপযোগী কাহিনীসূত্র লিখে দিয়েছেন প্রতিসর্গের প্রারম্ভে । তাঁর গদ্যাংশগুলি যেন Blue - Print বা নক্সা আর পদ্যে রচিত কাব্যটি যেন সেই নক্সা অবলম্বনে রচিত স্থাপত্য অপরূপ প্রাসাদ । প্রথম সর্গের নাম 'মনোরাজ্যপ্রয়াণ' । কবি গদ্যাংশে লিখেছেন, "স্বপ্নের কুহক" । মনোরথ যাত্রা অনেক দিনের পরে কল্পনার দর্শনপ্রাপ্তি ।" প্রথমেই স্বপন রমনীর ছবি । 'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেলে জাগরণ' স্বপনরমনী' 'কবির মনো-মন্দিরে খুলি' – দিল রহস্যের চাবি' । (পৃঃ - ২) এবং স্বপনরমনীর আগমন

কল্পনাকুমারী বাংলাকাব্যে রোমান্টিক ধর্মের আবির্ভাব-লগ্নে মধুসূদন কল্পনাকে আবাহন করেছিলেন, ''তুমিও আইস দেবি তুমি মধুকরী কল্পনা'' । দ্বিজেন্দ্রনাথও কল্পনাকুমারীর হাত ধরে স্বপ্নপ্রয়াণ করেছেন। কবিকে মনোরথ নামক বিমানে উঠিয়ে যাত্রা করল মনোরাজ্যের অভিমুখে । অর্থাৎ কবি স্বপ্নযোগে মনের গভীরে প্রবেশ করলেন ।

দ্বিতীয়সর্গ নন্দনপুর - প্রয়াণ । মনোরাজ্যের মধ্যেই নন্দনপুর । কল্পনার সাহায্যে কবি নন্দনপুরে পৌঁছলে কল্পনা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেল । তখন কবি নিঃসহায় হয়ে সখ্য ও দাস্যরসের সংস্পর্শে এলেন এবং জানলেন নন্দনপুরের রাজা আনন্দ নরপতি । মায়া তাঁর রানী । কল্পনা তাঁরি কন্যা । রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমোদবাস করেন বিলাসপুরে । আনন্দনরপতি স্বয়ং কবিকে নন্দনপুরের সৌন্দর্যদর্শন করালেন । কবি মুগ্ধাবিষ্ট হয়ে সেখানে চিরকাল থাকবার জন্য প্রার্থনা করলেন ।

''সতত এই ঠাঁই, স্থান চাই, আপের মত ।
সেই আশিস যাচি, তাঁরি লাগি শরণাগত ।''

মায়ামায়ার 'পাগলী সই' রাজসী কবির চোখে ভাবাঞ্জন মাখিয়ে দিলে কবি কল্পনার তিন সখী সুরুচি, মাধবী, শরৎময়ী সহ কল্পনাকে অন্তরে উপলব্ধি করতে লাগলেন । কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তামসী তথা তমোগুণ কবির মনকে বিষাদের ঘুমে নিমজ্জিত করল ।

' – অন্ধ তমো – রাশি ।
কোথা হতে আসি'
স্বপ্ন দেখা ঘুচাইল শেল হানি'বুকে ।।

কবি কল্পনার বিরহে অত্যন্ত ব্যথিত হলে মায়া - মার আড়ালে সখ্যরস কবিকে বিলাসপুর ভ্রমণে নিয়ে চলল ।

এই সর্গের কাহিনী কাঠামোতে বিভিন্ন পাত্র পাত্রীর সন্নিবেশ ঘটেছে । রাজসভায় স্বাস্থ্য, দাস্য, মৈত্রী, বাৎসল্য প্রভৃতি সভাসদ, নন্তা, মন্তা, শোভা, কল্যাণ প্রভৃতি নামাঙ্কিত চরিত্রও অঙ্কিত হয়েছে । এসব চরিত্র এসেছে কবির রূপকথা ব্যাখ্যার নিমিত্ত হিসাবে ।

কবি সূচনাংশে লিখেছেন, ''কবির বাল্যকালের আনন্দ -নিকেতন। কবি বাল্যকালে চিত্রকর্ম সঙ্গীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকিত – পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ পরিচয়(সাত্ত্বিকা)(সত্ত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়ামাতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী(রাজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার প্রতি প্রধাবিত করিল। তামসী(তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিন সখী, সুরুচি, মাধবী, শরৎশ্রী। সুরুচি কিনা কাব্য -রসাস্বাদন শক্তি - রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তীভাব – মাধুর্য - গুণ। শরৎশ্রী কিনা শারদীয় ভাব - প্রসাদ - গুণ।'' – অর্থাৎ কল্পনার সাহায্যে কবির কলালোকে প্রবেশ।

তৃতীয় সর্গ – বিলাসপুর প্রয়াণ – কবি মধ্যবয়সের সখে মায়ার আড়ালে বিলাসপুর যাত্রা করলেন। বিলাসপুরের রাজা প্রমোদ কবির বাল্যবন্ধু। প্রমোদের রাজসভায় কবি নৃত্যগীতি পটীয়সী নালসার কুহকে আবদ্ধ হয়ে এবং'হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়ে' পুনরায় কল্পনাকে হারালেন। তখন কবি পাগলের মত কল্পনার খোঁজ করতে করতে পৌঁছে গেলেন বিষাদপুরে। সভার মাঝখানে প্রমদাকে ছদ্মবেশী দৈত্য-গণ হরণ করলে কবি আরও দুঃখ সাগরে পতিত হন। এই অংশের ব্যাখ্যা দিয়ে কবি সূচনাতে লিখেছেন, ''নৌকায় করিয়া বিলাসপুর যাত্রা। মধ্য - রস প্রমোদ - রাজার সভার মাঝখানে কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে নষ্টামি পেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলা ধুলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গ - দোষে কবি নালসানায়ী আদিরসের প্রণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মতো হইয়া ছুটিতে ছুটিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল – এ ঘটনাটিও কবির মনোমনে আঘাত দিল।'' অর্থাৎ বিলাসিতা উচ্ছৃঙ্খলতা কবির আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

চতুর্থসর্গ - বিষ্ণাদপুর প্রয়াণ । 'কবি বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিষ্ণাদপুরের অন্তঃপাতি বিষ্ণাদারণ্যে গিয়া পড়িল । নানাপ্রকার খেয়াল দেখিতে লাগিল । আধিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল । কবি বিষ্ণাদপুরের রাজা হাহাহূহূ গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল । অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল ।''সখ্যের সমত্যাগ করে কবি প্রমোদরাজ্যের অধিকারের বাইরে বিষ্ণাদারণ্যে পৌঁছুলেন । সেখানে 'দিনমানে ডাকে শিবা রাত্রি অনুমাসে'(পৃঃ - ৩০) । কবি বিষ্ণাদারণ্যে পথভ্রান্ত হলে দৈত্যসম আধিব্যাধি কবিকে বিষ্ণাদভূপ হাহাহূহূ গন্ধর্বরাজার কাছে নিয়ে গেল । রাজা কবির বিচারের ভার জাড্যের হস্তে দিলেন । জাড্যের বিচারে কবি রসাতলে প্রেরিত হলেন । অর্থাৎ দুঃখের দিনে আধিব্যাধির প্রকোপ হাহুতাশের প্রাবল্য এবং তামসিক জড়তার প্রাধান্যে কবি চরম অধঃপতনের স্তরে পৌঁছে গেলেন ।

পঞ্চমসর্গ – রসাতল প্রয়াণ । রসাতলপতি ভয়ানক রস চামুণ্ডা দেবীর সামনে কবিকে বলিদানের জন্য পুরোহিতকে নির্দেশ দিল । সেই সময় এক কাপালিক রাজার কাছ থেকে কবিকে বলিদানের জন্য চেয়ে নিয়ে অশ্বত্থগাছের তলায় বেঁধে রাখিল । কবি অত্যন্ত কাতর হয়ে করুণাদেবীকে স্মরণ করলে করুণাদেবী কবিকে উদ্ধার করেন । কবি মূলনাংশে ব্যাখ্যা জুড়েছেন, ''জাড্যের (অর্থাৎ আলস্যের) ভগ্ন অনুচর আধিব্যাধি কবিকে রসাতল -পতি ভয়ানকরসের নিকটে সঁপিয়া দিল । ভয়ানক - রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে কবিকে বলিদান দিতে আদেশ করিল । ইতিমধ্যে ভৈরব নামক একজন করাল মূর্তি কাপালিক(যিনি ভয়ানক - রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলিদান দিবার ছলনে শ্মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে বাঁধিয়া রাখিলেন । করুণা - দেবী আসিয়া কাপালিকের হস্ত হইতে কবিকে,এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রজাকে,উদ্ধার করিলেন''। আলস্য ও আধিব্যাধির শিকার হয়ে অধঃপতনের চরমস্তরে পৌঁছে কবির মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হয় এবং তখন তিনি করুণা অর্থাৎ করুণরসকে অবলম্বন করে উদ্ধার লাভ করেন ।

ষষ্ঠসর্গ : -- সমর প্রয়াণ – এই সর্গে বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের আশ্রয়ে দুই দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম । ভয়ানক রসের পরাজয় । দুর্ভিক্ষের সহিত দাক্ষের , দারীর সহিত স্বাস্থ্যের, হিংসার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ভয়ানকের সহিত বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ । ''এই উদ্ভীবনের প্রতীক বীররসের সঙ্গে অধঃপতনের প্রতীক ভয়ানক রসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বীররসের জয় হলে কবি বীররসকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বীর্যের সহায়তায় শান্তির রাজ্যে গমন করেন ।

সপ্তম সর্গ:— শান্তিপ্রয়াণ । সূচনাংশে কবি ব্যাখ্যা দিয়েছেন রণবিমানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখিয়া কবির বৈরাগ্য উদয় । করুণার প্রসাদে মুমূর্ষুর লাভ । হৃদয়ের আশ্রমে গমন । পাশববৃত্তি সকলের উচ্ছেদ । সাধুসম্মিলন এবং দেব - সম্মিলন । শুভ পরিণয় । নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নাবসান । 'হতে - আহতে' সমাকীর্ণ রণ - ক্ষেত্র দেখে কবির মনে বৈরাগ্য এল --'আইনু' আইনু'

বৈরাগ্য । আশিনু'

ছাড়ি' ভব - দামনু যোগায় হই শিক্ষা ।''

(পৃ: - ১২৬)

কবি শান্তির উদ্দেশ্যে মহাতরে করুণাদেবীকে আহ্বান জানালেন ও'ভক্তের ঐ--মনে ব-ধনে পড়ি', স্বর্গ হ'তে নামি' – আইলেন দেবী যেথা-যানে ছড়ি । সঙ্গে একজন দিব্য-দরশন মহাপুরুষ, মুমূর্ষ । কবি এই মহাপুরুষ মুমূর্ষের সহায়তায় প্রথমে পথ দিয়ে শ্রেয়পথে প্রবেশ করলেন । এখানেও সত্য ও মঙ্গ নামে দুজন সাধুর সঙ্গ লাভ করলেন । তাঁরা কবিকে ধৈর্য - কবচ ও পরশু দান করে শ্রেয়পথে এগিয়ে যাবার উপায় সহজ করেদিলেন । কবি পরশুর সাহায্যে ভাগ, রাগ, ভুক্তুর, অভিমান, মহিম, গর্ব প্রভৃতি অর্থাৎ কাম, দ্বেষ, লোভ , মোহ , মদ ও মাৎসর্যকে বিনাশ করে শান্তিধামে পৌঁছোলেন । এখানে জ্ঞানসম্বৃপতি ও করুণাদেবী বীর্যের সঙ্গে প্রমদার, কল্যাণের সঙ্গে শোভার এবং কবির সঙ্গে কল্পনার বিবাহ দিলেন । অর্থাৎ পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যের

সহযোগে গড়ে উঠল এক আশ্চর্য আনন্দলোক। যে লোক কেবল কবির নয়, যোগী জ্ঞানী, সাধু, সন্ত মনুষ্য সকলেরই কাম্য।

— : ৭ : —

কবির কাব্যটি যে অন্তরঙ্গ তত্ত্বের একটি মূর্ত-এ আভরণ যাই তাতে সন্দেহ থাকে না। কবি মনোরাজ্য ভ্রমণ করেছেন। সবটাই মনের অভ্যন্তর জগতের ব্যাপার। ''এ-সমস্তই চিন্ময়। হর্ষ, বিলাস, বিষাদ, মূর্ছা, উদ্‌বোধ, উদ্‌ঘ, শান্তি — মনেরই বিচিত্র অবস্থা,' একের সী যান্ত পার হইয়া আর একটিতে কখন কেমন করিয়া গিয়া পড়ি তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই, এক মনেরই ভিতরে চতুর্দশভুবন এবং সেই নিখিলভুবনাধীন হইলের আনন্দ, নিখিল রসের তিনিই মনীভূত মূর্তি, মায়া তাঁর পত্নী।''[৫] কবি মনের বিচিত্র বিকাশকে পরিস্ফুট করার এই পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য রচনা করেছেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' অন্য কোন মানুষের মনোরাজ্যের অন্যানুসন্ধানের রূপক নয়, কবির জীবনের সত্যসৌন্দর্যের আদর্শ খোঁজার কাহিনী। কল্পনা মনোরথে করে কবিকে নন্দনপুর নিয়ে গেল। নন্দনপুর হল আনন্দলোক। কল্পনার চরম বিকাশে কবি আনন্দলোকে পৌঁছুতে পারেন। বাস্তবিক জগৎকে চরম লক্ষ্য মনে করলে কবিকে গভীর দুঃখে পতিত হতে হয়। কেননা কেবল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টি শ্রেষ্ঠ - কাব্যের লক্ষ্য হতে পারে না। এ যেন 'নন্দনপুর' তথা সত্য শিবা নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে চরম লক্ষ্য বলে মনে করায় কবিকে ভ্রান্তি জনিত দুঃখপঙ্কে নিমজ্জিত হতে হয়েছে। কবি নির্মল প্রমোদতলে বিলাসপ্রমোদে মগ্ন হলেন। লোভ লালসা তাঁকে ভুল পথে চালিত করল। 'হাস্যরসের মন্দাকিনীর দাসে' পড়ে কবি কল্পনাকে হারালেন।

৫। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত : স্বপ্নপ্রয়াণ : পৃঃ - ১৭২।

আলোচনা - কানাই সামন্ত।

অর্থাৎ বিলাসে, ব্যসনে, ভোগে কবির অন্তরস্থিত কল্পনার শুচিতা মলিন হয়ে গেল। কবির অন্তর হতে কল্পনা যদি বিদূরিত হয় তাহলে গভীর দুঃখভোগ ও হাহাকার ছাড়া আর পড়ি কি আছে। ফল কবির মন বিষাদে মগ্ন হয়েছে। কবির মনের এই বিষাদভাবকে আশ্রয়করে আধিব্যাধি হাহুতাশ কবিকে ক্রমশঃ গ্রাস করতে লাগল। কবি অধঃপতনের শেষ স্তরে পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ কবির চরম মানসিক পতন ঘটল। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়ে কবি ব্যাকুলভাবে করুণাদেবীর প্রার্থনা করলেন। শেষপর্যন্ত কবির চিত্তমধ্যে জাগ্রত বীর্যবত্তা ও উৎসাহ তাঁকে মানস পতন হতে উদ্ধার করল। কল্পনাকে হারিয়ে রসাতলের মুখে পড়ে কবির মনে যে ভয় জন্মেছিল তা দূর হল। কবি শান্তিধামে পৌঁছালেন। এখানে পুনরায় কল্পনার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটল। শুধু কবি - কল্পনার মিলন নয়। প্রদার সঙ্গে বীরের, শোভার সঙ্গে কল্যাণেরও মিলন ঘটল। কাহিনী বিন্যাসের খাতিরে বীরত্ব ও কল্যাণকে এবং প্রদা ও শোভাকে আলাদা করে দেখানো হলেও মনে হয় এরা কবি ও কল্পনারই রূপবিশেষ। যে কল্পনাকে কবি সৌন্দর্য-লোকে হারিয়েছিলেন আনন্দলোকে তাকেই তিনি ফিরে পেলেন। বীর্যে ও কল্যাণে কবিতার্থ কবি সৌন্দর্যরূপিনী (শোভা) ও আনন্দরূপিনী (প্রদা) কল্পনাকে পেয়ে চরিতার্থ হলেন। এটিই স্বপ্নপ্রয়াণের তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—

''নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবি কল্পনামাত্র, কিন্তু শান্তিপুরে যে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সত্তা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আরাধ্য ধনমাত্র নয়, যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মনুষ্য মাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনুষ্যজীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for art's sake নয়, এখন art for life's sake - এ দাঁড়াইয়াছে।' একই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়নাথ সেনও বলেছেন,''পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।''[৭]

৬। প্রমথনাথ বিশী : বাংলার কবি, পৃঃ - ২১।

৭। প্রিয়নাথ সেন : পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত, স্বপ্নপ্রয়াণ, পৃঃ - ১৬৬।

দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে যে তত্ত্বটি উপস্থিত করতে চেয়েছেন তা মামুলি বা সর্বজনবিদিত দার্শনিক চিন্তামগ্ন নয়, এতে আছে কবির অত্যন্ত মৌলিক ভাবনা। কবির সৌন্দর্য - সত্যের খোঁজে কাব্যটির আরম্ভ এবং মনুষ্যত্বের জীবনসত্য সন্ধানে কাব্যটির পরিসমাপ্তি। কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই তত্ত্বভাবনাটিকে উপস্থাপন করেছেন। বহিরঙ্গে একটি স্বপ্নময় কাহিনীর আড়ালে তত্ত্ব ভাবনাটি ঢাকা পড়ে যায় নি বা বিকৃত হয় নি। বাহ্য আখ্যানের সূত্র ধরে আভ্যন্তরীণ আখ্যানকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ এই কাব্যে কবি বাহ্যার্থের ও নিগূঢ়ার্থের দায় বলিষ্ঠ - ভাবেই বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আবার তাঁর দার্শনিক ভাবনাটি লেখাও অমূর্ত থাকে নি বা অপরিস্ফুট হয় নি। প্রথমাবধি চিত্রের পর চিত্র এঁকে সজীব ও উজ্জ্বল শব্দমালা গেঁথে প্রতিনিয়ত পরিস্ফুটন ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে কবির অত্যন্ত মৌলিক ভাবনাটিকে বাস্তব মূর্ত রূপ দিয়েছেন কবি, কবি যখন লেখেন,

''হও এ'স সজোরে ধরমে ব্রতী।
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা – ললনা,
শোভা – কল্পনা,
এসো মোর পারবর্তী লক্ষ্মী সরস্বতী।।''

কিন্তু, " অতঃপর ফিরাইয়া মুই পক্ষ
মুখা - মুখি দাঁড়-করাইল ভূপ যাহে যা'র লক্ষ।
শুভ সম্প্রদান
করি সমাধান,
মু - মুহূর্তে বাঁধি – দিল জীবনের সঙ্গ।।''

তখন কবির ভাবনা বাস্তবরূপ পেয়ে ধন্য হয়ে ওঠে। এবং কবির রূপক কর্মটিও কাহিনীভাগে কুহেলিকা কিম্বা গোলক ধাঁধাঁ সৃষ্টি না করে রূপক - সৃষ্টি হিসাবে সার্থক হয়ে ওঠে।

— : ঘ : —

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করবার যোগ্য। কাব্যটি পড়ে প্রথমেই মনে হয় একটি তত্ত্বকথা প্রকাশই কবির অভিপ্রায়। কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে করতে তিনি আধ্যাত্মজীবন ভাবনায় প্রবেশ করেছেন। এই তত্ত্বটি-তাই কাব্যের মূলগত স্বরূপ। এই ভাবনাটিকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্যই এই রূপক কাব্যের আয়োজন কবি করেছেন। কিন্তু কাব্যের নব নব মূর্তিতে উপলব্ধ হয়ে পড়ে। একাব্যের তত্ত্বগত অভিপ্রায়টি শেষ পর্যন্ত উপলব্ধে পরিণত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। কবি আদ্যন্ত নব নবমুখে অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু কবির শিল্পিপ্রবণ মন তত্ত্বের নগ্নরূপকে সর্বস্ব বলে মনে করতে পারে নি। নগ্নের পক্ষে যা হয়ত অতিরিক্ত সেইরূপ একটি রূপ-জগতের রঙের ছিটের জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের চিত্তের বৈশিষ্ট্যই এইরূপ। তাঁর মনের পক্ষে তত্ত্ব যেমন অপরিহার্য সেরূপ অপরিহার্য এই বর্ণের কল্পনার কবির বিপুল আনন্দ। এবং এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই প্রধান দেয় দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্ব তাঁর তত্ত্বভাবনার বাহনমাত্র ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্ব স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের ভারধারে একটা সৌন্দর্যস্বপ্নের রমনীয় জগৎ তৈরী করেছে। সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন,

''স্বপ্নপ্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব, কথায় কথায় অপ্রত্যাশিত অভাবিতপূর্ব অখণ্ড চিরপরিচিত চিত্রবাজি। ভাষা চোখেই পড়ে না। চিত্রই জাগিয়া উঠে। যেখানে চিত্র নাই, সেখানেও ভাষার একটি অবলীলাকৃত সজীব ভঙ্গীতে পাঠকের মন উদ্যত হইয়া থাকে। এইরূপের আদ্যোপান্ত মনটি সজাগ হইয়া বসিয়া থাকে এবং অবিরাম একটি বিচিত্র জীবনের আনন্দে মাতিতে থাকে।''[৮] বস্তুতঃ 'স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানি হইতে যে একটি মধুর রঙিনজ্যোতি বাহির হইয়া আসিতেছে .... তাহাতে আমাদের চিত্ত আনন্দের রশ্মিস্নাতে জাগিয়া উঠে, একটি বিরল কবিত্বলোকের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায় — ইহা সেকালের অন্যান্য কবিতায় প্রায় একেবারে দুর্লভ।''[৯]

৮। পুলিনবিহারী সেন : সম্পাদিত স্বপ্নপ্রয়াণ, সতীশচন্দ্র রায়ের আলোচনাসহ পৃ.-১৫১।

৯। ঐ জীবেন্দ্র সিংহরায় : কবিতার সীমানা, ১৯৭৩

-: ৩ :-

একটি রোমান্টিক নিখুঁতা মুগ্ধতা ও স্বপ্নময়তা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করলেও শিল্পরীতিতে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যটি ক্লাসিক ধর্মী। কাব্যটির ক্লাসিকধর্মিতার পরিচয় আছে তার গঠনকর্মে। একটা তত্ত্বাদর্শকে সম্বল করে দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যরচনায় অগ্রসর হয়ে প্রথমে মনোনিবেশ করেছেন বক্তব্যের উপযোগী একটা আখ্যান রচনায়। এ কাজ সহজ ছিল না। তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে অনেক সময় পশ্চিমস হারিয়ে যায়। আবার পশ্চিমসের দিকে নজর রাখতে গিয়ে তত্ত্বের খেই যায় হারিয়ে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ দক্ষ সেনাপতির মতো বাইরের পশ্চি ও ভেতরের তত্ত্বের দুই ব্যূহকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে আপন লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। কোথাও অনাবশ্যকের বোঝা নেই, কাহিনীর অগ্রগতিতে শৈথিল্য নেই, জটিল শাখা- প্রশাখায় বিভ্রান্তি নেই। "সর্গের সঙ্গে সর্গের ঘটনার সঙ্গে ঘটনার, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের যোগ এতো জোরালো ও অবিচ্ছেদ্য যে কাব্যটির গঠন সৌকর্য অবিসম্বাদী হয়ে উঠেছে।"[১০] প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "স্বপ্নপ্রয়াণের architecnics বা গঠন -সৌন্দর্য অসাধারণ। মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে স্বপ্নপ্রয়াণের কৃতিত্ব কম নয়। যেহেতু মেঘনাদবধ কাব্য একটি সুপরিচিত কাহিনীর নেতৃত্ব পাইয়াছে, পথভ্রান্ত হইবার বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণে নেতৃত্ব করিয়াছে একটি তত্ত্ব সে নিজেই ছায়াময়, - অলক্ষ্য প্রায় তাহার গতিবিধি, তৎসত্ত্বেও কবি সে পথ হারান নাই, শেষ পর্যন্ত যথাকালে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসীম মনীষা ও শিল্পশক্তি প্রকাশ পায়। ... এ দিকের বিচারে স্বপ্নপ্রয়াণ যথার্থ ক্লাসিক রীতির শিল্প।"[১৩]

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের স্থাপত্যোচিত নির্মাণকৌশলে বিস্ময়ান্বিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "স্বপ্ন-প্রয়াণ যেন একটা বৃহৎ অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহারকতরকমের কত পরাণ ছিএমূর্তি ও কারু নৈপুণ্য। তাহার মহলাগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ঝর্ণাশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে

১০। প্রমথনাথ বিশী : বাংলার কবি, পৃঃ - ২২ - ২৩।

— কেবল ভারের প্রাচুর্য নহে রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে । সেই যে একটি বড়ো জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে ।''[১১] বাস্তবিক রাজপ্রাসাদের নির্মাণ পদ্ধতির মত স্বপ্নপ্রয়াণের নির্মাণ পদ্ধতি অপূর্ব । এর সাতটি সর্গ যেন সাতটি মহল । ভাস্কর যেমন পাথর কেটে কেটে রাজপ্রাসাদকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যে ভরে তোলেন দ্বিজেন্দ্রনাথও তেমনি সূক্ষ্ম -সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যে 'স্বপ্ন - প্রয়াণ' কাব্যকে ভরে তুলেছেন । স্বপ্নপ্রয়াণ - রাজপ্রাসাদের স্তম্ভ কুঁদে কুঁদে কবি বিচিত্র শিল্পসৃষ্টি করেছেন, ভাস্কর্য গড়ে তুলেছেন । সাতটি সর্গের সাতটি মহল মিলে একটি সামগ্রিক স্থাপত্যধর্ম আছে, আবার প্রত্যেক স্তবকে আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ সৌন্দর্য যার মধ্যে যেন miniature - চিত্রের চমৎকারিত্ব । ''ইহাতে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র রস, বিচিত্র কল্পনা — বিচিত্র পাত্রপাত্রী বিচিত্র ঘটনা — বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গী ও বিচিত্র কারুকৌশল — যাহাদের একটিকে আর একটির সঙ্গে মিলাইবার একটির সহায়ে আর একটি গাঁথিয়া দিবার এবং পরিণামে চিত্তচমৎকারী অপূর্ব এক স্বপ্নসৌধ গড়িয়া তুলিবার অতুলনীয় এক প্রতিভা দেখা যায় । সৌধ স্বপ্নের বটে কিন্তু গাঁথনি আলগা নয় । মর্মরে গাঁথিলে যেমন হইবার কথা — তাহার বর্ণবিভাসে জ্যোৎস্নাধৌত মল্লিকাকুসুম দামের কথা মনে আনিলেও , তাহার কাঠিন্য ও ধৃতি তবু প্রস্তরের ।''[১২]

দ্বিজেন্দ্রনাথের মনের গড়ন ছিল ক্রীড়াশীল, লীলাপরায়ণ । লীলার আনন্দে যেমন নর্তকীর দেহে বিচিত্র মুদ্রাফুটে ওঠে তেমনি লীলাশীল দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায় বিচিত্র ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । কাব্য হচ্ছে,"Echo of the Poet's life ." কাব্যে কবির ব্যক্তিত্বের পরিচয় থাকে । বিহারীলালের রচনায় রয়েছে তাঁর ভাবোন্মত্ততার পরিচয় ।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি, সাহিত্যের সঙ্গী , পৃঃ - ৭৩ ।

১২। পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত : স্বপ্নপ্রয়াণ : কানাই সামন্ত — আলোচনা, পৃঃ - ১৭২ ।

সেকারণে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিচিত্রগামী প্রতিভার পরিচয় তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য । ''এল - ডোরাডোর পথে সোনা - যাত্রিকের ভড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্য স্বপ্নপ্রয়াণের এ পথঘাট আকীর্ণ । সে সব এতই প্রচুর যে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না । দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দূরদূরান্তের স্বপ্নকুসুম ভাসিয়া আসে, যেমন - ঐশ্বর্য তেমনি প্রাচুর্য ।'' [১৩]

কাব্যটির গঠনশক্তির আরেকটি প্রমাণ আছে চরিত্রসৃষ্টিতে। রূপক - কাব্যের চরিত্রের বিচিত্র প্রকৃতির টানাপোড়ানে আলোড়িত হবার অবকাশ নেই । কেননা সেগুলি রক্তমাংসের চরিত্র নয় । কবির আইডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে যাত্র । কিন্তু প্রতিভাশীল রচয়িতার প্রতিভা-গুণে চরিত্রগুলি রূপকের সীমায় আবদ্ধ থেকেও সজীব হয়ে ওঠে । স্বপ্নপ্রয়াণের কবিও চরিত্রগুলির প্রতীক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তাদের প্রাণবন্ত করে তুলেছেন ।

যেমন : -

''খাদিল তরুণ - রাত্রি ক্ষণ - পরে ,
'মায়াকবি এই ঠাঁই ' কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে ।
মাখিল সেগুনী ,
কল্পনা - তরুনী
মাখিল, মরাল যেন খেলি – সরোবরে ।''

এখানে কবি 'কল্পনা' নামে এক অতিরিক্ত নারীরূপ দিয়েছেন। এবং মরালের সরোবরে নাচার উপমা যোগ করে কল্পনা - তরুনীকে জীবন্ত করে তুলেছেন ।

অথবা ''সখা - রস যেমন আইল কাছে,
কবিবর উঠিয়া নিকটে গিয়া, সজোর্ণ যাচে ।
সখা মৃদু হাসি
কুসুম ছিড়াসি,
ঢালিল মধুর বাণী মুকলিত ভাঁচে ।।''

১৩। প্রমথনাথ বিশী : বাংলার কবি পৃঃ - ২৪

এবং ''পথ - কষ্টে গিয়াছে তোমার আজি সমস্ত দিবস,-
কিম্বা ''দিনের কুটীরে যো'হ্ চরণ -- পরশ ।।'' ইত্যাদি আতিথ্য পরায়ণবাক্য 'সখ্যরস' নামক একটি কাব্যশক্তিকে মানবিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে ।

''আবার যখন হাস্যরস বলে,
ও সব সখেপে সার ।
কবিতার, সবিতার, বনিতার, ভণিতার, কারো
নাহি ধারি ধার,
পেটুটি জানি সার
ঘণ্ডা যা'তে নয় পায় গণ্ডা দশ বারো ।''

তখন উদর সর্বস্ব সর্বত্রক একটি হাস্যকর চরিত্র পরিদৃশ্য হয়ে ওঠে । কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সম্পর্কে যেকথা বলেছেন, এ প্রসঙ্গে তা শিরোধার্য, —'' অত Originality
অমন রচনা সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই । ভাব সকল যেন Luscious ..১৪

গঠনসৌকর্যই 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র একমাত্র নির্মাণ বৈশিষ্ট্য নয় । 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র অন্যান্য সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে সমগ্র কাব্য জুড়ে । কোণার্ক মন্দিরের একখানা ভাঙা পাথর এনে যেমন তার নির্মাণ কৌশল বোঝান যায় না । তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র সৌন্দর্য অনুভূত হবে অখণ্ড 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য থেকে ।

-: চ :-

'স্বপ্নপ্রয়াণ' শিল্পরীতিতে ক্লাসিক কাব্য হলেও, অন্তরঙ্গ স্বভাবে কাব্যটি রোমান্টিক । রোমান্টিক কবি জগৎ ও জীবনের মধ্যে এক অজানা রহস্যের সন্ধান পান ও'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে আস্বাদন করেন । রোমান্টিক কবি - ভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্তমানের কুশ্রী দীনতা হতে, বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূঢ়তা থেকে মুক্তি নিয়ে মানসজগতে

১৪। বিপিন বিহারী গুপ্ত সম্পাদিত : পুরাতন প্রসঙ্গ - ১৩৭৩ পৃ - ৪৪ ।

আত্মনিমগ্নতা। যা অতি নিকট, অতি প্রত্যক্ষ তা রোমান্টিক কবিকে পীড়িত করে। তাই কবি বাস্তবকেও কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগে রঞ্জিত করে নেন। শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি বা সৌন্দর্যমুগ্ধতা নয় কল্পনাপ্রবণতার অসামান্য প্রসার ও বৈচিত্র্যসৃষ্টি রোমান্টিক কবির বৈশিষ্ট্য। কাব্যারম্ভে যে কল্পনাসুন্দরী কবির মনঃকমলে চরণ রেখে সপ্তভুবন পরিক্রমায় কবির সারথ্য করেছে সে কল্পনার ভিত্তিভূমি কবিরই মানসজগতে। কবির আবেগপূর্ণ উক্তিতেই তার পরিচয়। কবি কল্পনাকে বলেছেন,

''তোমা সঙ্গে তথায় না যা'ব যদি
কেন তবে এতেক সাধ্য - সাধনা শৈশব - অবধি।
তুই মম তপ।
তুই মম জপ,
তুই চাঁদে উন্মাদ বাসনা -- জলধি।।''

(মনোরাজ্য প্রয়াণ - ১১)

কল্পনার লীলাবিলাসে কবির মন সৃজনাত্মক হয়ে উঠেছে। কবি সপ্তভুবন ও মনের বিচিত্র অবস্থার চিত্র এঁকেছেন বহুবর্ণে বহুবৈচিত্র্যে যা ইন্দ্রধনুচ্ছটায় উজ্জ্বল। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে, পরিস্থিতির পর পরিস্থিতি রচনা করে দ্বিজেন্দ্রনাথ পাঠকদের যে নিজের আনন্দসঙ্গী করেছেন তা তাঁর কল্পনার বিপুল প্রখরতারই পরিচয়। কল্পনার সারথ্যে কবি'নয়নের একটি ইঙ্গিতে '' পার হয়েছেন'যোজনেক পথ', পার হয়েছেন সিন্ধু, ডিঙিয়েছেন পর্বত। আবার কল্পনারই গুণে, ''ধরাতল রসাতল নভস্তল। আনন্দে হ'ল একাকার, বর্ণনা বিফল।''''পুটি খোলার ভেতর থেকে যেমন অফুরন্ত স্বর্ণসূত্র বেরিয়ে আসে তেমনি কবির অন্তরের মণিকুটির থেকে কল্পনাশক্তি বেরিয়ে এসে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।'' ১৫

১৫। জীবেন্দ্র সিংহরায় : কবিতার সীমানা – ১৯৭৩, পৃ - ৭৭।

রূপকথার জগৎ সৃষ্টিতে তাঁর কল্পনা প্রসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, ''কবি কল্পনার মায়াজাল স্বপ্নপ্রয়াণে জ্যোৎস্নানিশিথের আলোছায়ার আলিম্পন মণ্ডিত কল্পপুরীর মোহমহিমা সঞ্চার করিয়াছে। .... সুপ্তিমগ্ন কবিচিত্ত উন্মনা রাজপুত্রের মত নিরুদ্দেশের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।''[১৬] তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে রাক্ষসখোক্কস দৈত্যদানাকে হত্যা করে যেমন রাজপুত্র রাজকন্যাকে লাভ করে কবিও মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ঘাত প্রতিঘাতের স্তর অতিক্রম করে আনন্দলোকে পৌঁছে কল্পনা-সুন্দরীকে লাভ করেছেন। স্বপ্ন ও বাস্তব, ছায়া ও মায়া মিশিয়ে তিনি যে রূপকথার জগৎ তৈরী করেছেন তাতে মূর্তিগুলিকে কখনও মনে হয় আমাদের নেহাৎই চেনা, কখনও মনে হয় সুদূর।

কবি কল্পনাকে আহ্বান রোমান্টিক কবির লক্ষ্য যে 'মধুকরী' কল্পনাকে মধুসূদন আহ্বান করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে পথ প্রদর্শিকারূপে গ্রহণ করে অসাধারণাত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই কল্পনাকে হারিয়ে তাই তাঁর চিত্ত হাহাকার করে উঠেছে —

''হায়! হায়! কল্পনা গেল চলি'।

কেন আর পিকবর কুহরে, গুঞ্জরে কেন অলি।

কেন আর মিছে
সমীর বহিছে।

কল্পনা যখন গেছে, গিয়াছে সকলি।''

(নন্দনপুর প্রয়াণ)

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ রোমান্টিক কবির আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

১৬। ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড প্রকাশ ১৩৬২ পৃঃ - ৪১৯।

কবি যখন লেখেন ,

''পুষ্পলতা মিলি - তুলি,
সখীরে হেলি - দুলি ,
করিছে কোলা - কুলি,
অভেদ প্রাণে ।'' (মনোরাজ্য প্রয়াণ- ২৪)

কিম্বা ,

''বসন্ত - বায়ুতে যথা কুসুমিত নিকুঞ্জ - বিপিন
মরমে মরিয়া হয় মধীরের একান্ত অধীন ,
ফুলের মঞ্জরী হ'তে অউরভ নিশ্বাস বেরোয় ,
যে-দিকে নোয়ায় মৃদু মধীরণ, সেই দিকে নোয় ।''
(বিলাসপুর প্রয়াণ - ৫৪)

তখন তাঁর প্রকৃতি প্রীতি মনের কতটা গভীরে নিহিত আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি ।

-: ছ :-

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' 'ভাব জুঁইর মালা' প্রথম থেকে শেষাবধি তিনি একের পর এক ছবি এঁকেছেন । নিপুণ চিত্রকরের মত এক একটা তুলির টানে । সমস্ত কাব্যটি যেন ছবিগুলি ছড়িয়ে আছে পুষ্পবৃষ্টির পুষ্পের মত । ছবি দিয়েই তাঁর কাব্যের আরম্ভ—

''সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ ,
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় তুলন্ত - তপন ।
স্বপন - রমনী
আইল অমনি ।
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ ।''
(মনোরাজ্য প্রয়াণ - ১)

অস্তগামী সূর্যের বর্ণাঢ্যটাকে অনুসরণ করে একটা স্বপ্নাবেশ গড়ে তুলেছেন তিনি। আর এই স্বপ্নাবেশে আবিষ্ট হয়েই একের পর এক ছবি অবলোকন করেছে পাঠক। কবি মধুর সুন্দর ছবি এঁকেছেন,

(১) ''মনোরাজ্য ঐখে হৈল সন্নিকট,
দূর - হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট।
গিরি নদীবন,
হর্ম্য সুশোভন,
তরে তরে শোভা - করে দিগন্তের পট।''
(মনোরাজ্য প্রয়াণ)

(২) ''যতগুলি হরিণ আছিল তাথি'
একে একে আসিয়া জুটিল তথি, কানন তেয়াগি।
নেত্র ফিরনয়
স্থির করি রয়,
নিদ্রা - তন্দ্রা পাসরিয়া স্থির - মুখ - লাগি।''
(নন্দনপুর - প্রয়াণ)

কবির চিত্র রচনায় প্রাণের স্বতোৎসারিত আনন্দধারা সর্বদা প্রবহমান। মাঝে মাঝে তার মধ্যে শোনা যায় বয়স্ক শিশুমনের হর্ষের সুর কখনও কবি ভাষানিবিড় অরণ্য, শব্দঘন ঝরণার ধার, ঝিল্লি - ঝঙ্কারের ছবি এঁকেছেন – সবকিছু মিলিয়ে কবি বস্তুর রূপ ও ধ্বনিকে মিলিয়ে একটা ভাষাঘন স্বপ্নজগত গড়ে তুলেছেন। তা অপেক্ষাও বড় কথা এই সবকিছুর মধ্যে একটা অতিরিক্ত আনন্দবর্ণ তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন, তা হল মুগ্ধ অলস অবশ শিথিলতা, রোমাঞ্চিত মুগ্ধত্বতার ভাব। কবি বনচর প্রাণীদের গতি আর শব্দকে শব্দচিত্রে যখন বেঁধে দিলেন তখন একটা সরল সতেজ শিশুর প্রাণস্পর্শী

কৌতূহলবোধ তার মধ্যে কম্পিত হতে থাকে।

' কত বাদুড়ের পাখা
ঝাপটি' তার শাখা
গতি করিয়া বাঁকা
ব্যাপিয়া যায়,
কত বা ঝুন - বিড়াল
বাহিয়া উঠি' ডাল
লম্ফে লুটের মাল
লাভায় গায়।''

(বিলাসপুর প্রয়াণ)

সমগ্র ছবিটির একটা সজীব প্রাণ চঞ্চলতা ফুটে উঠেছে। দিজেন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক রেখার সাহায্যে চিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন। শব্দের দ্যুতা 'বাক্‌প্রতিমা' গড়ে তুলেছেন।

কবি শব্দের অর্থ দিয়ে চিত্র এঁকেছেন,

''ঘাটময় বাজি ওঠে ভেকের ডমরু''—'ডমরু' শব্দের ব্যবহারে ব্যাঙের কোলাহল আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবল শব্দের অর্থে নয় শব্দের ধ্বনি দিয়েও কবি চিত্র এঁকেছেন।

(১)''ঝরিৎ ঝুরিৎ বহে তট চুমি চুমি।''

(২)''জামলা ঠেলিয়া বায়ু চলি যায় বলি 'মর্ মর্'।''

শাখা - প্রশাখায় জায়াশ্লিষ্ট বিশাল অরণ্যের ছবি এঁকেছেন।

''যথায় মহাবট, শিবে জট, অতি নিবিড়,
পানিছে চুপে - চাপে, ঝোপে - ঝাপে, অযুত নীড়।
নয়না নাচি' নাচি', ঊর্ধ্বগামী হইয়া উঠি,
বহে বিপুল - ভার, অংধকার ধরে ভ্রূকুটি।''

(নন্দনপুর -প্রয়াণ)

''গম্ভীর পাতাল । যথা কাল - রাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য । শূন্যে অযুত যামিনী - যামা
দিবা - নিশি ফাটি রোষে , ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা - সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময় ।''

(রসাতল প্রয়াণ)

বাংলা সাহিত্যে নরকের বর্ণনা নেই বললেই চলে । মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্যে প্রথম সেই অপরিচিত জগতের সন্ধান দেন । কিন্তু তাঁর চিত্রে ভয়ঙ্কর ভীষণ ততবেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে নি যত বেশী জীবন্ত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যে । কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথও প্রত্যক্ষভাবে নরকের বর্ণনা দেন নি, যা দিয়েছিলেন হেমচন্দ্র । দ্বিজেন্দ্রনাথ ভূতপ্রেত পিশাচ , রাক্ষস, দৈত্যদানা ইত্যাদি রূপকথা জগতের অনুভূতি গুলিকে রূপ দিয়ে নরকের চিত্র এঁকেছেন । এখানে অলৌকিক জগতের একটা ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন আছে, কাব্যিক পরিবেশ গড়েছেন তিনি । অন্যপক্ষে হেমচন্দ্র 'ছায়াময়ী'-তে নরকের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত জীবন্ত ও ভয়ঙ্কর । তবু দ্বিজেন্দ্রনাথের সার্থকতা তিনি 'পাতালপুরী' নামক একটা 'আইডিয়া'কে নিয়ে বিস্তৃত একটা সর্গ রচনা করেছেন এবং তাকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন নানাভাবে ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন যে ভাবকে অবলম্বন করেছেন তখন সেই ভাবকে আশ্চর্যরকমভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন । এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন, ''যখন যে ভাব, তখন সেই ভাবের আশ্চর্যরকমে, পরিপূর্ণরকমে উদ্‌বোধন দেখা যাইবে । বহির্জগতের এত চিত্র, এত খুঁটিনাটি চিত্র বাঙ্গালার আর কোন কাব্যেই নাই ।'' [১৭]

T.S.Eliotকাব্যসম্পর্কে 'Objective Co-relative'এর কথা বলেছেন অর্থাৎ কবি তাঁর মনের ভাব পরিস্ফুট করতে মানসিক অবস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কান্বিত বস্তুজগতের

১৭। সতীশচন্দ্র রায় : পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত , স্বপ্নপ্রয়াণ পৃঃ - ১৬০ ।

স্বল্প পরিধিতিতে একটা বিশাল প্রাকৃতিক অরণ্যের গভীরতা ফুটিয়ে তুলবার জন্য কবির যে বর্ণনা শক্তির প্রয়োজন দ্বিজেন্দ্রনাথের সে শক্তি ছিল। জটাধারী সন্ন্যাসী এবং রাগত অন্ধকারের ভ্রুকুটি এই বর্ণনাকে চাক্ষুষ করে তুলেছে।

সুন্দর মধুর চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে কিম্ভূত কিমাকার, অদ্ভুত অবিশ্বাসের চিত্রাঙ্কনেও কবির বিশেষ প্রবণতা এবং আশ্চর্য দক্ষতা লক্ষ করা যায়।

যথা : — '' ঝুপসি - ঝাপসি বন - আছোলে,
ঝাপসি - বদন সব উঁকি দেয়, ডর - দিয়া ডালে।
কিম্ভূত — আকার,
অতি চমৎকার,
প্রকাশ - পাইয়া উঠে, জোনাহ্ — মশালে ।।''

(বিষাদপুর - প্রয়াণ)

অথবা — ''মানুষ কি জানোয়ার বুঝা ভার,
দুই ভাই দেখা - দিল সম্মুখে, কিম্ভূত - কিমাকার।
ওষ্ঠ - মাস চৈলি,
দন্ত আছে মেলি,
চিমসিয়া অঙ্গুলিতে বক্র নখ - ধার।''

(বিষাদপুর প্রয়াণ)

কোমল গান্ধী ভাষা ব্যবহার করে রূপকথার জগত গড়ে তুলেছেন।

অবশ্য গম্ভীর ভীষণের ছবি আঁকতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কবি অন্তত্তর কোন নয়, মনোভাব বা বাল-সুলভ কৌতুক কৌতুহলকে প্রশ্রয় দেন নাই এমন উদাহরণও বড় অল্প নয়। সেকারণে পাতালপুরীর রূপবর্ণনায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন —

তুলনা দিয়ে থাকেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও বিমূর্তভাবকে চিত্রময় করে তুলেছেন বস্তুজগত থেকে মানসিক অবস্থার তুল্যবস্তু সংগ্রহ করে। চতুর্থসর্গের ১৯ - ২৫ স্তবকগুলি কবি মনের হতাশা ও বিষণ্ণতার অপূর্ব চিত্রকল্পন।

''দেখা দিল অদূরে বিষাদপুর।
ছেট্ট ছেট্ট করিয়া ডাকিয়া উঠে শ্মশান - কুকুর।
আয়ু করি ক্ষয়
দুষ্ট বায়ু বয়,
দুঃসময়, যেমন তেমনি ভাবাতুর।।
... ...
আঁধারিয়া আহয়ে বন - বাদাড়,
আবুড়া - খাবুড়া ভূমি, পগারে উগারে বাঁশ - ঝার।
নানা খানা - খন্দ
করে পথ বন্ধ।
দেখিলেই মনে হয় দেশটি উজাড়।।''

(বিষাদপুর প্রয়াণ - ১৯ -২৪)

শ্মশান - কুকুর, জ্বর - রোগী, বায়স, ভাঙা জানালায় বাতাসের হাহাকার, কালপেচক বন - বাদাড়, খানা - খন্দ প্রভৃতি অশুভ ও বিষণ্ণতার প্রতীকচিহ্ন যোজনা করে অনায়াসেই কবি তাঁর মানসিক অভিব্যক্তিকে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। কবির যাত্রা ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থা থেকে চিত্রময়তায়। আর পাঠকের যাত্রা সেই চিত্রের সোপান ডিঙিয়ে কবির অন্তর্জগতে। পঞ্চমসর্গ ৩৪ স্তবকে নরকের বীভৎস পরিমণ্ডল রচনা করেছেন কবি চিত্রেরই সাহায্যে। যেমন —

'' শবের সে বুকের উপরে চড়ি'
মুখে ঢালি' - দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি' পড়ি' ।
ক্ষণে ক্ষণে, শব
করে আর্ত - রব,
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে, উঠে ধড় - ধড়ি''
(রসাতল প্রয়াণ)

এই নরকের চিত্র পরম্পরার উদ্দেশ্য কবির মানসিক অধঃপতন পরিস্ফুট করা । কবির মানসিক অধঃপতনে অনুতাপ যন্ত্রনার রূপায়ণ এই নরকযন্ত্রণার ছবি । কবি বিরলরেখার সাহায্যে চিত্রটিকে সজীব করে এঁকেছেন ।

কবি শুধু বস্তুময় চিত্র আঁকেন নি, লালসা করুণা ইত্যাদি মনের বিভিন্ন ভাবনুভূতি ও সখ্যরস, বীররস, হাস্যরস প্রভৃতি কলাজগতের বিভিন্ন রসবিভাগের চিত্র এঁকেছেন দক্ষ চিত্রকরের মত । যথা -

'' এতেক বলিয়া বাণী, কবিবর,
নিক্ষেপ করিল পুষ্প লালসার বক্ষের উপর ।
লালসা নিরস্ত্র ,
সাজনায় বস্ত্র,
হাসিয়া কুড়ায় পুষ্প, অঙ্গ থরথর ॥''
(বিলাসপুর প্রয়াণ)

লালসা নারী মূর্তিটি অনন্যভাব - প্রতিমায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।

মুগ্ধ প্রয়াণের কাব্যমহিমা কাব্যটির বর্ণনা বৈচিত্র্যে । কাব্যটির সরল কাহিনী, পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা , ভাবভঙ্গী সব কিছুই বর্ণনাময়ী । বর্ণনাগুলি -

-চিত্রময়, চিত্রগুলি বর্ণময় এবং বর্ণ বৈচিত্র্যে হৃদয়ভাবের দ্বারা বিশেষভাবে রঞ্জিত। বসন্তের আগমনের রূপটি যৌবনাবেগের সমস্ত প্রকাশে বিশিষ্ট। যেমন -

'' দখিণের দ্বারখুলি মৃদু মন্দ - গতি
বনভূমে পদার্পিয়া ঋতু কুলপতি
নতিকার পাটে পাটে ফুটাইয়া ফুল।
অঙ্গে ঘেরি - পরাইল পল্লব - দুকুল ।।''

কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয় - বাতাস ।।
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
'' এ নহে সে'' বলি' শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ।।
মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে।
কুঞ্জিতে লাগিল পিক বসিয়া শাখীতে ।।
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে।
এখনে মিলাইয়া যায় কানন - গভীরে ।। (নন্দনপুর প্রয়াণ)

শব্দে শব্দে কমনীয়তা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি একটি নম্র কল্পনাবিলাসের রঙও যেন তার সঙ্গে মিশে আছে। তবে কোথাও তা অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। শব্দ কে-ন্দ্র ত্যাগ করে শব্দের সুর দিগ্বিদিকে ধাবিত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রপ্রাণ কবি - ভাবকে তিনি ছবির মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেন। সুরকে ঢঙে রূপান্তরিত করে তোলেন। কোমল সুন্দর ভাবমকল প্রকাশে কবির স্বাভাবিক নৈপুণ্য বারবার প্রকাশ পেয়েছে।

উপবনের রক্ততায় কবিচিত্তের আনন্দচাঞ্চল্য চিত্ররূপ ধারণ করেছে —

'' পুষ্পলতা ঝিলি - জুলি',
সমীরে হেলি - দুলি;
করিছে কোলা - কুলি,
অভেদ প্রাণে ।।
পথ দিয়া দেখা - যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায় ,
হেলিয়া, তরু , তায়
ছায়া বিছায় ।
নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারিদিক,
নয়ন অনিমিখ
ফিরান' দায় ।'' (মনোরাজ্য প্রয়াণ)

এই জাতীয় চিত্রের প্রতি কবিচিত্তের আকর্ষণ সন্দেহ নেই । এই প্রসঙ্গে কবি বিহারীলালের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনা করা যেতে পারে । বিহারীলালও প্রধানতঃ কোমলতার কবি । তাঁর শব্দগুলি পর্যন্ত কাঠিন্যহীন - বহুক্ষেত্রে অস্থিহীন । কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের কমনীয়তা কাঠিন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত । গদ্যধর্মী শব্দের ব্যবহারে, সমাসবদ্ধপদের বহুল তৎসম শব্দের প্রয়োগে, কোমল চিত্রকল্প অনেকটা বিপরীত রসের সঙ্গে সমন্বিত যেন । যেমন -

'' বাতায়ন পেয়ে মুক্ত,
মলয় মুধা - সিক্ত ,

সৌরভ সমুদ্ভ
হিল্লোল হানে ।
কল্পনা সুধীরে উঠি',
ধরি' কপাট - দুটি ।
আঁখিরে দিল ছুটি
বাহির - পানে ।। ...'' (নন্দনপুর প্রয়াণ)

প্রথমদিকে' সমুদ্ভ ' শব্দটির ব্যবহার যেমন লক্ষ্য করবার মত, তেমনি শেষদিকে' ছুটি' কথাটির প্রয়োগের দিগ ও কামনার রোমান্টিক আবেগ ব্যঞ্জিত হয়েছে । আবার স্বর্গোৎফুল্ল চাঞ্চল্য রূপ পেয়েছে নিম্নলিখিত শব্দ বন্ধে —

'' ছুটিছে ফোয়ারা, স্বর্গে মতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি' - উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা ।
না পেয়ে নাগাল
ছাড়ি' দিয়া হাল ।
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি' হয় সারা ।।'' (নন্দনপুর - প্রয়াণ)

উদাহরণটিতে' উঠিয়া, ধরিতে' প্রভৃতি শব্দের পদ্যাত্মক আবেদন স্বর্গোন্মত্ত ফোয়ারাধারার আকাশ কামনাকে তীব্রতর করে তুলেছে এবং 'মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি হয় সারা' বাক্যের সাহায্যে ফোয়ারার জলের মাটিতে আছড়ে পড়ার ছবিটি সরসতা ও সজীবতা পেয়েছে । দ্বিজেন্দ্রনাথের চিত্ররূপ রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জীবেন্দ্রজিৎ রায় বলেছেন, '' বাইরের জগৎকে কবির মনোগত করার জন্য যে প্রখর ইন্দ্রিয় চেতনা আবশ্যক তা —

দ্বিজেন্দ্রনাথের সহজাত ছিলো। তাই তিনি অবলীলায় দৃশ্যজগতের চিত্রকর্মে হস্তক্ষেপ করতে পেরেছেন। ... প্রকৃতের চিত্ররূপ রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। তার চেয়ে কঠিন নিরবয়ব ভাবের অবয়ব - সংস্থান এবং সৌন্দর্যের স্তরে তার উপস্থাপন। স্বপ্ন - প্রয়াণের মূল বিষয় এবং তার শাখা প্রশাখা তত্ত্বাশ্রয়ী ও নির্বস্তুক। শিল্পকলার খাতিরে সেই নিরাকার আইডিয়াগুলিকে সাকার করে তোলার যে দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছিলো তা তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছেন। নিরাকারকে সাকার করা, অনুভূতির বিষয়কে চিত্রবৎ প্রত্যক্ষ করে তোলা দুঃসাধ্য শিল্পকর্ম। তার জন্য চাই রূপ ও সৌন্দর্যের চেতনা এবং শব্দোপকরণ নিখুঁতভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই দুটি কবিশক্তির অভাব ছিলো না বলে ভাবের চিত্র রচনায় এমন মুন্সীয়ানার পরিচয় তিনি দিতে পেরেছেন। মনে হয় কল্পনায় প্রতিটি ভাব সহজেই তাঁর প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠতো।'' ১৮

- : ৩ :-

কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে স্বভাবতঃই আসে ভাষার কথা। ভাবে নয়, ভাবের প্রকাশমাধ্যমেই কবি প্রতিভার পরিচয়। আর ভাষার ভাবপ্রকাশের অন্যতম বাহন। সে কারণে ভাষা সৌন্দর্যের উপর কাব্যের মাধুর্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। ''স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য ভাষা ও ছন্দের অসাধারণ নিরঙ্কুশতায় অপূর্ব রচনা - মাধুর্য লাভ করেছে।

'স্বপ্নপ্রয়াণের' ভাষা ছিল গদ্যভিত্তিক। কেননা দ্বিজেন্দ্রনাথ গদ্যভাষার যুক্তিশৃঙ্খলা ও স্পষ্টতার ভক্ত ছিলেন। আগে পরের অধিকাংশ গদ্য রচনার মাঝে -

---

১৮। ডঃ জীবেন্দু সিংহ রায় : কবিতার সীমানা, ১৯৭৩, পৃ - ৮১।

'মুগ্ধ -প্রয়াণ' কাব্য লিখতে গিয়ে তিনি পদ্যভাষার আবহাওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন নি। সে কারণে তিনি পদ্য কাঠামোকে গ্রহণ করে ছ-দ অলংকারের সাহায্যে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে আগে এসেছে 'লজিক্যাল সিকোয়েন্স' এবং পরে এসেছে' রেটোরিক্যাল সিকোয়েন্স' পদ্য - কাঠামোর উপর কাব্যের তুলি চালিয়েছেন,

'' আগে দেশ - কাল - পাত্র বিবেচনা,
তারপর শিখা - দান, এক বিন্দু দোষের সূচনা
নাহি পায় স্থান -
চাই অবধান,
দুখে না পড়ে গো যেন ভগ্ন রস - কণা।'' (নন্দনপুর প্রয়াণ)

এরূপ পদ্যগন্ধী ভাষা'মুগ্ধপ্রয়াণের' সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন পদ্যভিত্তিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তেমনি গ্রহণ করেছেন একান্তই দেশীভাষাকে। তাঁর ভাষা কথ্যরীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি নিজেই বলেছেন, ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোন ভাব উদিত হয় যা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী-ভাষায় প্রকাশ করা যায় তাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom - এ অনুবাদ করতে যাব কেন ? আমি কখনও ও পথ মাড়াই নি।'' ১১ এই মনোভাবের ফলেই দেখতে পাই নিত্য লোক ব্যবহার্যশব্দ এত প্রচুর পরিমাণে' মুগ্ধপ্রয়াণ কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি অনায়াসে ঠাঁই, আবাস, বারোখেসে, চোক, আকু - বাঁকু, বেচারা, এঁরে, উস্-খুস্, বিড়বিড়, পেটু, ঠেস্, পাঁদাড়ে, ইত্যাদি কথ্য শব্দকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। সেকালের কবিতায় লৌকিক শব্দের ব্যবহার এরূপ নিষিদ্ধ ছিল সেদিক থেকে -

---

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধক চরিতমালা, অষ্টখণ্ড, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ - ২৮।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার অনেকখানি বৈপ্লবিক সন্দেহ নেই ।

ইংরেজী রোমান্টিক কবিগণ ওয়ার্ডস্বার্থ, কীটস, কোলরিজ সকলেই কথ্যভাষার সমর্থক ছিলেন । কথ্যভাষার নিজস্ব একটা জোর আছে । তার গতি দ্রুত এবং তা জীবন্ত । শিকড় যেমন সমগ্র গাছটিকে প্রাণরস দিয়ে বাঁধিয়ে রাখে, তেমনি মুখের ভাষা থেকেই কবিতার ভাষা পায় তার প্রাণশক্তি, তার প্রকাশশক্তি তার গতি ও ছন্দের সহজ এবং অবাধ সঞ্চারণ ক্ষমতা । সচেতনশিল্পী দ্বিজেন্দ্রনাথ কথ্যভাষার এই প্রাণস্পন্দনটুকু উপলব্ধি করেছিলেন বলে কথ্যভাষার গতিকে ও প্রাণোজ্জ্বলতাকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন । তাঁর কাব্যভাষা পালতোলা নৌকার মত দ্রুতগতিতে সহজভঙ্গিতে এগিয়ে গেছে । শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত ও জীবেন্দ্র সিংহরায় মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথের চলতিভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ঈশ্বরগুপ্তের' বোধেন্দুবিকাস'-এর ভাষা বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় থাকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ চলতি ভাষাগ্রহণের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন উক্ত অনুবাদিত নাটকটি থেকে । এ যুক্তি হয়ত অযৌক্তিক নয় । তথাপি একথা সত্য যে তাঁর ভাষারীতি কথ্যভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি ভাষাকে নানাভাবে নবরূপ দিয়েছেন । কেননা তিনি বুঝেছিলেন মুখের ভাষার যেমন প্রাণশক্তি আছে, তেমনি তার দৃঢ়তা ঘনত্ব বা স্থায়িত্ব নেই, সে ক্ষণস্থায়ী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল, নিয়ত ক্ষয়িষ্ণু । সেকারণে ভঙ্গিটা বাংলা রেখে প্রয়োজন মতো সাধুরীতির শব্দ জুড়ে কখনো নিয়ে এলেন মাত্রাগুণ, কখনো দিলেন তাতে কথ্য - স্পন্দ ।

যেমন — ''ভ্রমে যবে গেল ঘুচি'
বলিল আঁখি মুছি ,'
''জ্বালাস্‌নে সুরুচি,
সব লো সর্ ।
একান্ত বধিবি যদি,
মারিস্‌নে দগধি,
মিনতি ধর্ ।'' (নন্দপুর প্রয়াণ)

সাধু ও চলতি শব্দ একই সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কল্পনার কথায় গতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। কখন হসন্ত শব্দ এবং স্বরান্ত সাধু শব্দকে পাশাপাশি বসিয়ে তিনি এক নতুন স্টাইল তৈরি করেছেন। কবিতার জগৎটা যে একটা অবাস্তবতার জগৎ, কবিতার শব্দ যে এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দ, কাব্যস্বাদ বলতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার বাইরে যে একটা মানসিক অভিজ্ঞতা বোঝায় দ্বিজেন্দ্রনাথ যেন এসব কিছুকেই অস্বীকার করতে চাইলেন। স্বপ্নপ্রয়াণের দেশীয় ভাষারীতি সর্বদা একটা বাস্তববোধকেই জাগিয়ে রাখে – যথা – ''নারায়ণ। নারায়ণ। বলে ডঙ্ক,

যশ্রী বলে দেখেছ ও আমায়, করিব
খণ্ড - খণ্ড।''

বলে ডুন্ড - ডপ

'' কবি ডপ - ডপ
রাজার কল্যাণ তরে, তেই এই দন্ড।'' (বিষাদপুর প্রয়াণ)

দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন, ''দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষা ঠিক তাঁহার অন্তরটির ছবি। ঠিক ঐ রকম সরল অথচ শ্রী ছিরযুবা সত্যান্বেষী একাগ্র।''[২০]

''দ্বিজেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদও অতুলনীয়। বিষয় অনুযায়ী শব্দের ভোল বদল হইয়া যায়। ধ্বনি ও ধ্বনির অনুষঙ্গ একরূপ রাখেন না। একেবারে অভিজাত ও সাহিত্যিক, একেবারে ঘরোয়া ও লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা। আর তাহারই মাঝে মাঝে উদ্ভাবিত বা উদ্ধৃত আনকোরা কত নূতন শব্দ – এ সমস্তই কবি কী আশ্চর্য কৌশলে মিলাইয়াছেন, পুরু ভেজালী দোষ হয় নাই। কোথাও তাল কাটে নাই, সেই এক বিস্ময়ের বিষয়। বুঝিতে পারি, ভাষার উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের কী দখল ছিল, কী মাহম ছিল, কি দরদ ছিল এবং কি ভাবে তিনি ভাষার প্রকৃতি ও ভাষার মেজাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া ধ্যান করিয়াছেন।''[২১]

২০। পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' - পৃঃ - ১১৭। অজিত চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র।

২১। কানাই সামন্ত ঐ পৃঃ - ১৭৭।

''কবিতা যে নির্মাণ নয় সৃষ্টি, এটাই প্রথম ও শেষ কথা। কাব্য ভাষা একাধারে এই সৃষ্টির উপাদান এবং হাতিয়ার। সৃষ্টি মানেই রূপ - সৃষ্টি। আর রূপমানেই সীমা। কবির কথায়' অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখনই সৃষ্টি সার্থক হয়।' সুমিতাকে পেতে হলে সুমিতকে অর্থাৎ সীমাকে স্বীকার করে নিতে হয়, সীমার মধ্যেই সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কাব্যসৃষ্টিতে তাই স্বাধীনতা নেই, বন্ধন আছে। বন্ধন সেই ভাষার কাছেই, কেননা ভাষা দিয়েই সৃষ্টি। এই বন্ধন থেকে একমাত্র মুক্তি সার্থক রূপসৃষ্টিতে। কবির বা আর্টিস্টের পক্ষে অন্য মুক্তির অর্থ নেই।'' [২২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ চিত্ররীতির কবি। সেকারণে তিনি শব্দ দিয়ে, ভাষা দিয়ে শব্দ কল্প, রূপকল্প গড়ে তুলেছেন। এবং এই রূপসৃষ্টিতে কবির যথার্থ মুক্তি ঘটেছে। কোমলপদী ভাষা ব্যবহার করে রূপকথা জগতের চিত্র এঁকেছেন,

''ঝুপুসি - ঝাপুসি বন আবডালে।
হাপুসি - বদন সব উঁকি দেয় ডরদিয়া তালে।
কিম্ভূত আকার
অতি চমৎকার
প্রকাশ পাইয়া উঠে। জোনাহ্ মশালে।''

রূপকল্প সৃষ্টিতে তাঁকে সাহায্য করেছে রূপক, উপমা - উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার। তাঁর "কাব্যকথা উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষার মৌলিকতায় ঝলমল, অনুপ্রাসের গুঞ্জনে কলকূজিত।'' [২৩] তিনি রূপক প্রিয় কবি। সেকারণে রূপকের প্রসাধন কলায় তাঁর নৈপুণ্য ছিলো অসাধারণ -

''কবি কহে 'তব আগমনে আজ
কবিত্ব - কাননে ঘোর দেখা - দিল নব ঋতুরাজ।
তব - মুখবনে
কাব্য উপবনে
ফুটিয়া সুগন্ধি ফুল করিছে বিরাজ''। (নন্দন-প্রয়াণ)

২২। সুশীল রায় : বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ : দ্বিজেন্দ্র মিত্র - কবিতার ভাষা ও আধুনিকতা - ১৯৭৬ পৃ - ১৪৬।
২৩। ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য়খণ্ড, পৃ - ৪২০।

কেবল রূপক নয়, উপমা উৎপ্রেক্ষাও নানান ভঙ্গিতে তাঁর কাব্যে এসেছে। কখন কবিরই প্রয়োজনে সহজভাবে, কখন কবি বৈদগ্ধ্যের দৃষ্টান্ত রূপে। কবি কাব্যের শুরুতেই দু'দুটি উপমার মালা হাতে স্বপনারমনীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন —

" সুপ্তিতে ডুবিয়া — গেল জাগরণ,
সাগর - সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত - তপন।
স্বপন - রমনী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ ।। (মনোরাজ্য প্রয়াণ)

বিশুদ্ধ উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারও কাব্যটিতে বিরল নয়।

যেমন, ''করুণা - দেবীরে দেখি
বীর - রস বলে একি।
সাক্ষাৎ ভবানী এ -যে জলদ - বিমানে।
পাদপদ্ম তলে বসি
আধো - ঢাকা মুখ — শশী —
কমলা বিরাজে যেন কমল - বিজানে।''(সমর - প্রয়াণ)

উপমা - উৎপ্রেক্ষা ছাড়াও ব্যতিরেক, কাকু-বক্রোক্তি, সমাসোক্তি, অপহৃতি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন তিনি স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে।

শব্দের অর্থে চিত্রগুণের সঙ্গে সঙ্গীতগুণ থাকে। অনুপ্রাস ও ছন্দে সঙ্গীত মাধুর্য উপলব্ধি হয়। অনুপ্রাসের সহজ ব্যবহার কাব্যটিতে সঙ্গীত মাধুর্য এনেছে।

যথা — (১)'কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে'।

(২)'পালিছে চুপে - চাপে খোপে খাপে, অযুত নীড়।'

অবশ্য তিনি সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্ররীতির কবি । সেকারণে তাঁর কাব্যে চিত্রই প্রধান । তবু কোথাও কোথাও সঙ্গীতময় নিবিড় মাধুর্য কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করে ।

যথা — ''তোলো তোলো হে বসন্ত ইহার আঙুল দুটি ধরি
আর উঠিবে না ?
কেন আর ঘুমিছ গো মধুকর গুণ্ গুণ্
আর ফুটিবে না ?
মরণেরে করিয়াছে পরাণের প্রিয় —
ভুলানে কথায় আর কাণ দিবে কি ও ।'' (বিনাশপুর প্রয়াণ)

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যে যুক্তব্যঞ্জনের প্রয়োগ পরিমিত । তিনি বহুক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন স্থলে স্বরভক্তি আনয়ন করেছেন । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছন্দের মাত্রাপূরণের পরজ্ঞ ।

উদা : — মউরভ, মউমরণ শবদে, চতুর বরণ ,
মরবাউল , দরপণ, অরপণ, অউষধ প্রভৃতি ।

স্বরপ্রয়াণের ভাষা আলোচনায় একটা পৃথক প্রবন্ধ হতে পারে । সে চেষ্টায় না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে দ্বিজেন্দ্রনাথ conventional system of symbols ব্যবহার করলেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন নতুন কোন অভাবিত শব্দ বা বাগ্‌ভঙ্গি প্রয়োগ করে । যখন তিনি পদ্মের তুলনা করেন 'অলসিত আঁখিসম আধো আধো ফুটি' তখন চোখের সঙ্গে পদ্মের তুলনা যদি বা মনে হয় সংস্কৃতরীতির অনুকরণ অলসিত বিশেষণটিই কবির নিজস্ব অনুভূতির প্রয়োগ ।

তেমনি — যেন কুঞ্জবন
আপনারই মন,
কল্পনা বসিয়া আছে পদ্মাসনে তার । (বিনাশপুর - প্রয়াণ)

এখানে উপমেয় কুঞ্জবনকে উপমান মন - এর সঙ্গে তুলনা করায় ব্যাপারটি প্রথাসিদ্ধ হয়নি ।

আবার –"বড় বড় বাদুড় কোথাও ঝুলে,
ব্যাঘ্র - জিনি কোথাও কালো - বিড়াল, গরজিয়া
ঘুলে ।"(বিম্বাপুর - প্রয়াণ)

এই কল্পনায় আর যাই হোক কালো বিড়ালের ব্যাঘ্রকে জয় করায় বাঁধা পথ ধরে চলবার চেষ্টা নাই । তবে 'শিমল নয়নে যেন যমের কোপানল জ্বলা ।' অথবা 'হাস্যরব উঠে যেন শিবার বিলাপ ,' করুণা দিলেন দেখা প্রমদার নয়নে , – জলদাসনে যেন চন্দ্রলেখা ।– এই সব উপমা সাধুরীতির অনুগত বটে, তবে এগুলির মধ্য দিয়ে কবি বৈদগ্ধের কিছু পরিচয় পাঠকের কাছে পৌঁছায় যে কারণে এগুলিকে প্রথাগত জীর্ণ অলংকার মনে হয় না ।"বস্তুত দ্বিজেন্দ্রনাথের স্টাইলের একটি বড়ো লক্ষণ এই যে তিনি যেমন সংস্কৃত কাব্যরীতি অন্ধ অনুসরণ করেন নি, তেমনি সমসাময়িক কাব্যরীতির পড়ালিকায় ভেসে যান নি । এরই মধ্যে থেকে তিনি নিজের প্রেরণা অনুযায়ী শব্দচিত্র রচনা করে চলেছিলেন ।"[২৪]

ভাষা প্রসঙ্গে আসে ছন্দের কথা । দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাষার ন্যায় ছন্দের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটিয়েছেন । মৌলিকতা এনেছেন । তিনি প্রচলিত ১৪ মাত্রার পয়াররীতি অনুসরণ না করে নিজস্বরীতির শ্লোক উদ্ভাবণ করেছেন । তার প্রথম চরণ ১২ মাত্রার , দ্বিতীয় চরণ ১৮ মাত্রার , তারপর ৬ মাত্রার দুটি সার্থ পর্বে মিল , তারপর ১৪ মাত্রার একটি পয়ার চরণ । তাঁর চরণের মিলের রীতি ক ক খ খ ক । সমস্ত স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে এই রীতির শ্লোক বজায় রাখতে তিনি বিশেষ সর্তক ছিলেন মনে হয় ।

২৪।দ্রঃ ভবতোষ দত্ত : কাব্যবাণী, ১৯৬৬ পৃঃ - ১৪৪ ।

: - ৰঃ +

কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আসে প্রভাবের কথা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য লিখতে বসে দেশী, না বিদেশী রূপক রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। প্রিয়নাথ সেন লিখেছেন, ''সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রবাবু এই দুই রূপক হইতে, ডাণ্ডাসারেই হউক, অডাণ্ডাসারেই হউক ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন।''[১] তিনি ইংরাজী সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ রূপক রচনা স্পেন্সার - এর 'ফেয়ারী কুইন' ও বুনিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেসে'র কথা বলেছেন। কানাই সামন্ত মহাশয়ও বলেছেন, ''ইংরেজী সাহিত্যে দুখানি রূপককাব্য বহুখ্যাত, তাহারই দুরাগত স্মৃতিস্মৃতি হইতে বর্ত্তমান লেখকও বঞ্চিত নন। একখানি স্পেন্সারের 'ফেয়ারী কুইন' আর একখানি হইল বুনিয়ান - এর 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস''[২]। তিনি আরও লিখেছেন, ''ইংরাজী দুইখানি কাব্যের উল্লেখ করিয়াছি, এ দেশীয় একখানি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ করিয়া তুলনা দেওয়ার প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই নাটকটি হইল শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের সহিত রুচিতে প্রকৃতিতে প্রকাশ শক্তিতে মিল নাই, কিন্তু জাতিগত সে মিল আছে তাহাই প্রণিধানের বিষয়।'' অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত প্রত্যক্ষভাবে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র প্রভাবের কথা বলেছেন, ''আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মূলে প্রত্যক্ষ প্রভাব যদি কোন কিছুর থেকে থাকে তবে ঈশ্বরগুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাস' এবং সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রভাবই ছিল।''''বোধেন্দুবিকাস''সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বাংলা অনুবাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ করেছিলেন। সেই যুগে প্রবোধচন্দ্রোদয় যে বহু পঠিত এবং বহু অনূদিত গ্রন্থ ছিল তার প্রমাণ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত দিয়েছেন তাঁর 'বাঙালির সাহিত্য' গ্রন্থের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে। বহুপাঠী দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই বই পড়া থাকার কথা। বাস্তবিকই উক্ত দেশী বিদেশী রূপক রচনাগুলির সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১ সুকুমার সিংহ সম্পাদিত। সাহিত্যসাধক চরিতমালা। ১৭৯৯ ভবতোষ দত্ত। পৃঃ - ১৬৫।

প্রথমতঃ দেশী বিদেশী উক্ত রচনাগুলি রূপক আঙ্গিকে রচিত। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যও রূপক রচনা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে প্রথম সংস্করণে কাব্যটিকে রূপক বলে বর্ণনা করেছিলেন। অর্থাৎ জাতিগত দিক থেকে প্রত্যেকটি কাব্যই পরস্পর সম্পৃক্ত। ইতালীয় কবি দান্তের 'ডিভাইন' কমেডির সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। প্রমথনাথ বিশী সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন –''আর একখানি মহাকাব্যের সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে সেখানি দান্তের ডিভাইন কমেডি।''*

দ্বিতীয়তঃ রূপক কাব্যের নায়ক বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অভীপ্সিত বিষয় লাভ করেন। 'ফেয়ারী কুইন' এ নাইট অফ দি রেড ক্রস্ পবিত্রতার এবং বিশ্বস্ততার উপাসক নায়িকা উনাকে বিপদমুক্ত করে স্বীরূপে লাভ করবার জন্য অভিলাষী। কিন্তু মিথ্যা (Duessa) এবং Archimago (কাপট্য) প্রভৃতির চক্রান্তে ভ্রান্তির অরণ্যে পথ হারান ও নিরাশার পঙ্কুরে পতিত হন। পরে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে অভিলষিত বস্তুকে লাভ করেন। বুনিয়ানের রূপকের নায়কও মুক্তিলাভের জন্য গৃহ থেকে নির্গত হয়ে কাপট্য, মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভৃতির মতলব সংগ্রাম করে বিশ্বাস, আশ্বাস, ভগবান সতর্কতা প্রভৃতির সাহায্যে পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মুক্তিলাভ করেছে এবং দিব্যধামে পৌঁছেছে। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আখ্যান বিন্যাস অন্য-ধরণের হলেও এখানে প্রবৃত্তিপত্নীগণের চক্রান্তে (মহামোহ রাজ, ত্রৈগুণ্য আদি) আত্মবিস্মৃত ও বন্দীকৃত আত্মাকে নিবৃত্তি পত্নীগণের (বিবেক বৈরাগ্য) উদ্যমে প্রবোধচন্দ্রের উদয়ে স্বাস্থ্যলাভ ও স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের নায়কও নায়িকা কল্পনাকে লাভের জন্য সচেষ্ট। কল্পনার প্রতি নায়ককে বিমুখ করবার জন্য প্রমোদরাজ, লালসা, হাস্যরস প্রভৃতির সাহায্যে জাল বিস্তার করেছিল। কিন্তু নায়ক দাস্য, সখ্যরস, বীররস প্রভৃতির সহায়তায় অশেষবিধ বিপদ অতিক্রম করে শমদমের সাহায্যে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় এবং জ্ঞান-দণ্ড তার হস্তে কল্পনাকে দান করেন। নায়ক কল্পনার সঙ্গে মিলিত

* [illegible]

হয়ে একজীবন লাভ করেন – এটিই 'স্বপ্ন- প্রয়াণ' রূপককাব্যের সহজ আখ্যানবস্তু ।

এদিক থেকে 'ডিভাইন কমেডি'র সঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র সাদৃশ্য আরও একধাপ এগিয়ে । 'ডিভাইন কমেডি'র নায়ক স্বয়ং কবি দান্তে । এবং তাঁর পথপ্রদর্শিকা ছিলেন প্রথমে ভার্জিল পরে বিয়াত্রিচে । 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র নায়কও স্বয়ং কবি । গ্রন্থমধ্যেই তার প্রমাণ আছে ।

—— ''ভাতে যথা সত্য - হেম মাতে যথাবীর ,
গুণ জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির ।
নবশোভা ধরে যথা সোম আর রবি ,
সেই দেব - নিকেতন আলো করে কবি ।''

বিলাসপুরের ভূপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে কবি উক্ত চরণ গুলিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন – সত্য = সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেম = মেঘেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণ = গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি = জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোম = সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর , রবি = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবনিকেতন = মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন , কবি = দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্পষ্টতঃই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিবরণ ।

এবং প্রথমে কল্পনাসুন্দরী ও পরে করুণাদেবী ছিলেন কবির পথপ্রদর্শিকা । প্রথমসর্গ 'মনোরাজ্য - প্রয়াণে'ই কল্পনার আগমন ও কবিকে নিয়ে পরিভ্রমণ –

''কিবা রাস- গুচ্ছ বাগাইয়া ধরি ,
মুখ ফিরাইল কলপনা - বালা মৃদু হাস্য করি ।
কবিবর তায়
কি যে ধন পায়,
এক দৃষ্টে চাহি -রয় সকল পাসরি ।''(মনোরাজ্য - প্রয়াণ)

পঞ্চমসর্গে করুণাদেবীর আগমন ও কবিকে উদ্ধার রসাতল থেকে ।

তৃতীয়ত : রূপক কাব্যগুলির মধ্যে একটি করে অভিযাত্রার কাহিনী আছে । এ যাত্রা ভৌগোলিক যাত্রা নয় । কবির মনোলোকের আভ্যন্তরীণ যাত্রা অর্থাৎ মানস পরিভ্রমণ । 'ফেয়ারী কুইন' নীতিলোকে যাত্রার কাহিনী, 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস - এ বুনিয়ান বাইবেলের ধর্মীয় প্রেরণাকে অবলম্বন করে ধ্বংসনগর থেকে দিব্যনগরে আধ্যাত্মিক যাত্রার বিবরণ রচনা করেছেন । 'ডিভাইন কমেডি' ঈশ্বরমুখী দিব্যযাত্রার কাহিনী । 'স্বপ্নপ্রয়াণে'ও একটা যাত্রা আছে, সে যাত্রা একান্তই কবির মনোরাজ্যে আদর্শযাত্রা । নন্দনপুর প্রয়াণ থেকে শান্তিপুর প্রয়াণে যাত্রার কাহিনী । বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা । তবে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' বা 'বোধেন্দুবিকাসে' কোন যাত্রা নাই ।

চতুর্থত : - রূপক কাব্য মূলতঃ নীতিমূলক বা আদর্শমূলক হয়ে থাকে । ফেয়ারি কুইনের নাইটেরা নানারকম পরীক্ষা পার হয়ে একটা আদর্শ নীতিলোক প্রতিষ্ঠার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে । পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস্' ও 'ডিভাইন কমেডি'তে রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষলাভের বা ঈশ্বরমুখী দিব্যযাত্রার নীতি প্রতিষ্ঠা । 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' ও একটি আদর্শমূলক রচনা - আদর্শমূলক জীবনতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে এখানে । 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যেরও একটা আদর্শ আছে । সে আদর্শ কাব্যালোকের আদর্শ । অর্থাৎ 'art for art's sake' থেকে 'art for life's sake'- এ উত্তরাণের আদর্শ ।

পঞ্চমতঃ -'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস', 'ফেয়ারি কুইন' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র চরিত্রগুলি হয় মানসিকগুণের, নতুবা মানববৃত্তির অথবা রচয়িতার এক একটি ভাবের প্রতীক । স্পেন্সার তাঁর কাব্যে নাইটদের বিভিন্ন গুণের প্রতীকরূপে কল্পনা করেছেন । যেমন রেডক্রস পবিত্রতার, সারগায়ন সংযমের, স্যার আর্টিন্যাল ন্যায় - বিচারের, স্যার ক্যালিডোর সৌজন্যের প্রতীক । আবার নারীচরিত্র উনা সত্যের, ডুয়েসা মিথ্যার, কুটিলতা কৌমার্য-শক্তির প্রতিমূর্তি । বুনিয়ানও চরিত্রগুলির প্রতীকধর্মী নামকরণ করেছেন —

ওয়াইজম্যান, ফেথফুল, হোপফুল, জায়্যাণ্ট, ডেস্‌পেয়ার, মার্সি প্রভৃতি । শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র তাঁর নাটকে লোভ, মোহ, ক্রোধ, শান্তি, করুণা ইত্যাদি মানবিক বৃত্তিগুলিকে চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছেন । চরিত্র কল্পনার দিক থেকেও 'স্বপ্নপ্রয়াণ' উক্ত রূপক কাব্যগুলির সমগোত্রীয় । দ্বিজেন্দ্রনাথ কলাজগতের বিচিত্রগুণ, রসজ্ঞতা, প্রসাদগুণ, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ প্রভৃতিকে সুরুচি, শরন্ময়ী, মাধুরী, সাত্ত্বিকা, রাজসী ও তামসীরূপে কল্পনা করেছেন । এছাড়াও পিল - গ্রিমস্ প্রোগ্রেসের দি স্যো অব ডেসপণ্ড দিভ্যালি অব হিউমিলিয়েশন, দি ভ্যালি অব দি শ্যাডো অব ডেথ, ভ্যানিটি কেয়ার, দি ডিলেক্টবল, মাউনটেনস্ ইত্যাদির সঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়া'-ণের নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতলপ্রয়াণ, শান্তিপ্রয়াণের রূপকল্পনায় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ।

ষষ্ঠত : - নিদ্রা যাওয়া ও নিদ্রাভঙ্গের মধ্যে স্বপ্নদর্শন পাশ্চাত্য সাহিত্যের রূপক কাব্যের প্রথা হিসাবে দেখা দিয়েছিল । ইংরেজী রূপককাব্য Pearl' - এ দেখি কবি কাননে নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন । সেখান থেকেই কাব্যের সূত্রপাত । এবং কাব্যটির সমাপ্তি কবির জাগরণে । মাঝখানে কবি স্বপ্ন দেখেছেন এবং স্বপ্নদর্শনের মধ্য দিয়েই কাব্যের মূল বক্তব্য রূপায়িত হয়েছে । Langland রচিত 'The Vision of Piers the Plowmen" — এ আমরা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখি । তবে দেশীয় রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে' কিম্বা 'বোধেন্দুবিকাসে' এ বৈশিষ্ট্য নাই । কিন্তু ঊনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যসাহিত্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'আশাকাননে' (১৮৭৬) শিবনাথশাস্ত্রী তাঁর 'নির্বাসিতের বিলাপে' (১৮৬৮) উক্ত প্রথাকে গ্রহণ করেছিলেন । 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যেও নায়ক কবি কাব্যের শুরুতেই নিদ্রা গিয়েছেন, —'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ' — এবং কাব্যের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কবির নিদ্রাভঙ্গ —' এ হেন সময়ে কবি উঠিল চেতন লভি ।' মাঝখানে কবি স্বপ্নদর্শনে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মূল বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন ।

সপ্তমতঃ - রূপক কাব্যগুলিতে একটা পূর্ব পরিকল্পনা ও স্থাপত্যসৌকর্য লক্ষ করা যায়। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' স্থাপত্যধর্মিতার নিদর্শন। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র গঠন সৌকর্য আলোচনায় আমরা দেখেছি আলোচ্য কাব্যের স্থাপত্য নিপুণ ভাস্করের শ্রেষ্ঠ শিল্প। এবং পূর্ব পরিকল্পনার বলেই তিনি এতখানি দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দেশীয়রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র সঙ্গে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের উপকরণগত মিল থাকলেও বিদেশীরূপক কাব্যগুলির গঠনগত বৈশিষ্ট্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে বর্তমান। সুতরাং স্বভাবতঃই শ্রদ্ধেয় ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের কথা স্মরণ রেখেও সন্দেহ হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রোদয় থেকে উপকরণ আহরণ করলেও রূপকাব্যের স্থাপত্যগত পরিকল্পনার ব্যাপারে হয়তো ইউরোপীয় রূপকের কাছেও তার খানিকটা ঋণ বর্তমান।

: - ৯ : -

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য নামকরণে স্মরণীয়। প্রথমতঃ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সার্থক ও শ্রেষ্ঠ রূপকাব্য। দ্বিতীয়তঃ মেঘনাদবধ-কাব্যখানিকে বাদ দিলে স্বপ্নপ্রয়াণ বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সার্থক দীর্ঘকাব্য। তৃতীয়তঃ রসের বিচারে কাব্যরীতি ও ভাষণ পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে এর স্থান। চতুর্থতঃ ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি দক্ষছন্দকুশলী। পঞ্চমতঃ বাংলা সাহিত্যে কবিজীবন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাব্যেই প্রথম স্বীকৃত হয়। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এ সম্পর্কে লিখেছেন, ''সারদামঙ্গল কাব্যেও কবি জীবনের ইতিহাস আছে কিন্তু কবি সেখানে শিল্পী নয়, সাধক, তাছাড়া ''যৌবনবিরহ প্রীতিবিরহ সরস্বতীবিরহের'' সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া এমন এক মিশ্ররসের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার মধ্যে কবি জীবনকে সঠিকভাবে

খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়।''[২৫] অন্যপক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ কবিজীবনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও ইতিহাসকে কাব্যের মুখ্যবিষয়ে পরিণত করে নিজের অজ্ঞাতেই বাংলা রোমান্টিক কাব্যরীতিতে নতুন প্রাণ ও বেগ সঞ্চার করেছেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের বিশেষত্বের আরও একটি কারণ তিনিই প্রথম 'কল্পনা'কে পথপ্রদর্শিকা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আগে মধুসূদন 'মাধবকরী কল্পনা'কে আহ্বান করেছিলেন কি-ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ইংরাজী সাহিত্যের ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ - এর মত কবিকে যোগী ও সাধকের পদে উন্নীত করে কবি জীবন - রহস্যের উদ্ঘাটনে সারথি করেছিলেন কবি কল্পনাকে — এই কল্পনা রোমান্টিক কবির কাব্যরচনার প্রধান আশ্রয় দ্বিজেন্দ্রনাথ এই কল্পনাকেই নিয়ন্ত্রী ও পথপ্রদর্শিকা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ডঃ ভবতোষ দত্ত মহাশয় লিখেছেন, ''বিহারী - লালের কাব্যে আরও মূর্ত এবং অশরীরীরূপে যা সৌন্দর্যলক্ষ্মী সারদা, দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যে তাই কল্পনা। বিহারীলালও কবি কল্পনার সঙ্গে করুণার নিত্যযোগ কল্পনা করেছিলেন। বিহারীলালের সৌন্দর্যকল্পনা একদিকে করুণাময়ী অন্যদিকে জীবনের মহৎ - বৃত্তি বা মনুষ্যত্বের আদর্শে পবিত্র। 'স্বপ্নপ্রয়াণেও কল্পনাকে লাভ করবার পথে এই মহত্ত্ব ও কৃচ্ছ্রসাধন আছে।''[২৬] প্রমথনাথ বিশী মহাশয় লিখেছেন, পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথের 'কবিতাকল্পনালতা'র সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের কল্পনার আত্মীয়তা। আমাদের দেশে মুখ্যত: রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শিল্পীকবি সাধক ও প্রফেট - এ পরিণত হইয়াছে, আর কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনের যাবতীয় রহস্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে। কবি ও কল্পনার নূতন পদবীর প্রথম আভাস স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে। আমার ধারণা সত্য হইলে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আর একটি গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'রবি উদয়ের' আগে যে অরুণাভা নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে স্বপ্নপ্রয়াণের সেই ইঙ্গিত পাই। এই কাব্য 'প্রভাতসংগীতের পূর্ববর্তী 'ব্রাহ্মমুহূর্তের সংগীত'. স্বপ্নভঙ্গ হইবার পূর্বতন অবস্থায় এখানে আমরা নবকাব্যের নিকটকে দেখিতে পাই।'[২৭]

২৫। প্রমথনাথবিশী : বাংলার কবি পৃঃ - ১৫।

২৬। ডঃ ভবতোষ দত্ত : কাব্যবাণী ১৯৬৬ পৃঃ - ১৪০।

২৭। প্রমথনাথ বিশী : বাংলার কবি পৃঃ - ১৬।

– : ট : –

''বিশ্বপ্রাণ' কাব্য সম্পর্কে আলোচনায় সমালোচকেরা সকলেই আলোচ্য কাব্যটিকে রূপক কাব্য পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক কাব্য বলেছেন। কিন্তু এতখানি সার্থকতা অর্জনের কারণ নির্ণয় করেন নি কেউ। আমার মনে হয় একই সঙ্গে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় দৃঢ় মনীষার ও অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী হওয়ায় শ্রেষ্ঠ রূপককাব্যের স্রষ্টারূপে তিনি চিহ্নিত হতে পেরেছিলেন।

শ্রেষ্ঠ রূপককাব্যে একটা দার্শনিক তাত্ত্বিক বক্তব্য থাকে। যেহেতু রূপককাব্য, সেকারণে দার্শনিক বক্তব্যটিকে প্রথমাবধি প্রবাহিত করতে হয় কাব্যিক বক্তব্যের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে। এবং এই ত্রিস্থাকর্মটি তখনই নিপুণভাবে করা সম্ভব হয় যখন কবি একই সঙ্গে দার্শনিকতা ও শ্রেষ্ঠ কবিত্বের অধিকারী হন। কবি দার্শনিক - তত্ত্বটিকে 'আপনমনের মাধুরী' মিশিয়ে তার একটি কাব্যিক রূপ দেন। রূপে - রসে, শাখায় পল্লবে, ফুলে, ফলে, অঙ্কিত করে, রসে - ধ্বনিতে, ভাষায় – অলংকারে পরিপূর্ণ করে ব্যঞ্জনাময় করে তোলেন কবিত্বের শক্তিতে। অন্যপক্ষে দার্শনিকতার সুদৃঢ় সংহত সংযম কবির পরিবিস্তারী কল্পনাকে সমাহিত করে তত্ত্বের গভীরতা দান করে। ফলে কবিত্ব কল্পনার প্রস্ফুটনে ও তত্ত্বের সংযমে কাব্যটি শিল্পগত স্থাপত্য ও ভাবনাগত সুদৃঢ়তা লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে - পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎ পরিচয়ের সামান্য একাংশমাত্র — সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুক - দিগের, স্রষ্টা-দিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতর রূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ নীতি কবিতা রসয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত

কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য ।''[২৮]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথের কেবল 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নয় সমগ্র রচনা আলোচনায় , বিশেষ করে তাঁর সমগ্রজীবন আলোচনায় দেখা যায় বাস্তবিকই তাঁর প্রতিভায় কবিত্ব ও দার্শনিকতার মিশ্রণ ঘটেছিল । তিনি ছিলেন একইসঙ্গে উচ্চ - শ্রেণীর দার্শনিক ও অসাধারণ শক্তি - সম্পন্ন কবি ।

কিন্তু তত্ত্বের উপস্থাপনা করে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, ''আগে বরাবর আমি বাঙ্গলা কবিতা লিখতাম । কবিতা রচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল ।''[২৯]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ''আমার বাল্যকথা'' গ্রন্থে অগ্রজের কবিত্ব প্রসঙ্গে লিখেছেন ''.... তাঁর শিক্ষাগুণে বড়দাদা সংস্কৃত কাব্যে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন । সংস্কৃত পদ্যে একটি কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তাঁর সেই সময়কার রচনা । ..... বড় দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন .....''। [৩০]

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর রচিত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে মধুসূদন কাব্যটির প্রশংসা করে বলেছিলেন ''আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গলায় ভাল কবিতা রচিত হতে পারে না, 'মেঘদূত' প'ড়ে দেখছি, সে ধারণা ভুল ।'' [৩১]

২৮। রবীন্দ্র রচনাবলী - ১৩ শ খণ্ড ।

২৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : [illegible]
ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিজেন্দ্রনাথ পৃ - ৭ ।

৩০। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা , পৃ - ২৩ । ১৩৭৭

৩১। মধুসূদন দত্ত : চিঠিপত্র , সংখ্যা - ২৮ ।

দ্বিজেন্দ্রনাথই যে 'মেঘদূতের পদ্যানুবাদক একথা জানতে পেরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন, ''কালীদাসের কাব্যের যে সকল অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনমতে কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবেক না। আমরা ভরসা করি আমাদিগের প্রিয় গ্রন্থকার তাঁহার শৈশবোৎপন্ন কবিত্বের দূতস্বরূপ মেঘদূতের সাফল্যে এতদ্দেশীয় যুবকগণের নিকৃষ্টামোদ পরিহরণ পূর্বক বীণাপাণির অনুধ্যানে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকিবেন।'[৩২]

বাল্যাবধি দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা কবিপ্রতিভা সক্রিয় ছিল উক্ত তত্ত্বগুলি থেকে তা প্রমাণিত হয়। এবং মাত্র উনিশ কুড়ি বছর বয়সে 'মেঘদূতে'র অনুবাদ রচনা করায়, তাঁর রসানুভব শক্তি ও সৌন্দর্যস্পৃহা কতখানি প্রখর ছিল তা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। মনেরাখা প্রয়োজন সেই সময়টি ছিল ঈশ্বরগুপ্তের সময়। ''ঈশ্বরগুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন[৩৩]। বস্তুতঃ চিরাচরিত নৈতিকতা, সামাজিক ভাল-মন্দের আদর্শ, ব্যঙ্গ-পরিহাস তখন কাব্যগত আদর্শ হিসাবে প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত খণ্ড - কবিতা লেখার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি ভাবময় গীতিকবিতা ছিল না — তাতে কবির অন্তর্লোকের সৌন্দর্যমুখতা বা নিভৃত ভাবপ্রেরণা প্রকাশ পায় নি। সেগুলি ছিল তথ্যমূলক ও সামাজিক বিষয় প্রধান। অন্যদিকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশচেতনা এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য রচনা করেছিলেন। এই পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের মেঘদূতের অনুবাদ অবশ্যই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ 'মেঘদূত' বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সৃষ্টি। সেইরূপে এই কাব্যটির অনুবাদের ইচ্ছাটাই ছিল অভিনব। কেননা কালিদাসের কালের জীবনভাবনার সঙ্গে তখনকার সামাজিক জীবনভাবনার কোন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। ঈশ্বরগুপ্তের পর বাঙালী কবিরা ইংরাজী

৩২। বিবিধার্থ সংগ্রহ, আষাঢ়, ১৭৮১।

৩৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা,
৬ষ্ঠ খণ্ড দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর পৃঃ - ১।

শিক্ষার সম্বন্ধ নিয়ে সাহিত্যে পদক্ষেপ করেছিলেন। মধুসূদন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যনীতির দ্বারা চালিত হবেন না। রঙ্গলাল পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় এবং হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার কাব্যপ্রসঙ্গে বলেছেন তাঁদের আবাল্য আগ্রহ ইংরাজি সাহিত্যের প্রতিই। ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি চর্চারকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগের সাথে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করেছিলেন তার প্রমাণ 'মেঘদূতে'র অনুবাদ। এই অনুবাদের দ্বারা তাঁর সৌন্দর্যরসে অবগাহনের আনন্দ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি এর ভাষা সৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি। ''দ্বিজেন্দ্রনাথের এই অনুবাদের মহৎ কৃতিত্ব এই যে খাঁটি বাংলা ভঙ্গি রক্ষা করেও তাতে তিনি আধুনিক গীতিকাব্যের ধ্বনিগুণ সম্পন্ন মিউজিক্যাল স্টাইল ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই যুগের আর কোন কবিই তাঁদের গীতিকবিতায় এই স্টাইল নিয়ে আসতে পারেন নি।''[৩৪]

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন তাঁর পরিচয় আছে তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়া - কলাপের মধ্যে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৩০১ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন এবং পরিষদের সভাপতি রূপে 'একালের দর্শন' সম্মুখে চারদিন (১৮ অগ্রহায়ণ, ৮ মাঘ, ১১ ও ২৫ চৈত্র - ১৩০৬) বক্তৃতা করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষদের উদ্যোগে ১৩২০ সালের ২৭ - ২৯ - এ চৈত্র কলকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে তিনি মূল সভাপতি হিসাবে অভিভাষণ দেন। এই অভিভাষণটিও ছিল দর্শনতত্ত্বমূলক।''[৩৫]

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য রচনার পূর্বে তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৬৬ - ১৮৬৯) এবং 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনার পর তিনি আর 'কাব্যপ্রয়াণ' করেন নি,

---

৩৪। ডঃ ভবতোষ দত্ত : কাব্যবাণী, ১৯৬৬ পৃঃ - ১৩০।

৩৫। অভিভাষণটি প্রবাসী বৈশাখ সংখ্যা ১৩২১ এ প্রকাশিত হয়েছিল।

'তত্ত্বপ্রাণ' কাব্য রচনার পূর্বে ভারতখণ্ডে তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৬৬ – ১৮৬৯) এবং 'স্বপ্নপ্রাণ' রচনার পর তিনি আর 'কাব্যপ্রাণ' করেন নি, 'তত্ত্বপ্রাণে' মনোনিবেশ করেছিলেন। ক্রমে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গহনে পথ হারিয়েছিলেন। তাঁর দার্শনিকতা সম্পর্কে তাঁর সাহিত্য গুরু সুধাকান্ত রায় চৌধুরী লিখেছেন, ''দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। দর্শন শাস্ত্রে, সংগীতশাস্ত্রে, চিত্রাঙ্কন বিদ্যায়, জ্যামিতিতে, অঙ্কনশাস্ত্রে ও সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। কিন্তু তিনি শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে তত্ত্বজ্ঞানী এবং দার্শনিক হিসাবেই সুপরিচিত।''[৩৬]

কবির আরেকজন অনুগত শ্রদ্ধেয় সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় লিখেছেন, ''একদিকে তিনি ছিলেন শিশুর মত সরল, অন্যদিকে ছিলেন প্রাজ্ঞ জ্ঞান তপস্বী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক।''[৩৭]

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভায় দার্শনিকতা ও কবিত্বের মিশ্রণ ঘটেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন দর্শন নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন তখনই তিনি 'স্বপ্নপ্রাণ' কাব্যটি লিখেছিলেন। সেকারণে তিনি বলেছিলেন, ''আমার যথার্থ কবিতার mood যখন ছিল – অর্থাৎ সেই বাল্যকালে আমি এই কাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই, সে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মগ্নচিত্ত ছিলাম তাই জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে।''[৩৮] 'স্বপ্নপ্রাণ' কাব্যে 'metaphysics' থাকিলেও এ কাব্যের কবিত্বের

৩৬। সুধাকান্ত রায় চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মৃতিকথা ১৩৭৬, পৃঃ - ১।

৩৭। সুধীরঞ্জন দাস : আমাদের শান্তিনিকেতন – ১৩৭৭ পৃঃ - ২৫।

৩৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ষষ্ঠ খণ্ড দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ - ১২।

অসাধারণ মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। আর metaphysics এর সবল কাঠামো অন্তরালে ছিল বলেই, এই কাব্য রূপকাব্য হতে পেরেছে। প্রবীণ প্রমথনাথ বিশী মহাশয় লিখেছেন, ''স্বপ্নপ্রয়াণের গুরুত্ব এই যে, এ গ্রন্থ কবিত্ব ও তত্ত্বের টানা-পোড়ানে গ্রথিত, ইহার কঙ্কালটা তত্ত্বের, রক্তমাংস কবিত্বের আর প্রাণ সজীবনযন্ত্র কল্পনার। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশের পূর্বেই চারখণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচনা করেন নাই। আগেও তত্ত্ব পরেও তত্ত্ব মাঝখানে একবারের জন্য কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রন্থি বাঁধিয়া গিয়াছে।''[৩১]

''... কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রন্থি রহস্য উপলব্ধি করেন বিশ্বলোকের মাঝখানেই, দৃশ্যরূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন অপরূপকে, দর্শনাতীতকে। এই কথাটা সুন্দর করে বলেছেন তাঁর মারিতাঁ, আধুনিক কাব্য ও শিল্পকলার বোধকরি সবচেয়ে জ্ঞানী ও মধুময় অধিবক্তা' কবির উপলব্ধি উপলব্ধ বস্তুগুলিকে প্রাণস্পন্দিত ও স্বচ্ছ ক'রে তোলে, সেই স্বচ্ছ আবরণের ওপারে আমরা দেখতে পাই দিগন্তের পর দিগন্তের বিস্তার। ... কবি এক অসীম রহস্য অনুভব করেন বাস্তবজগতের রহস্যের মধ্যেই।''[৪০] দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর উপলব্ধ দর্শনবিষয়টিকে – কবিত্বের শক্তিতে স্বচ্ছ ও প্রাণস্পন্দিত করে তুলেছেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে। আর আমরা পাঠকেরা সেই স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে এক অসীম রহস্যকে উপলব্ধি করতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি দিগন্তের বিস্তার কাব্যের সঙ্গে পরমার্থের সংযোগ সাধনে।

''দার্শনিক যদিও যুক্তির দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তবু তাঁর চিন্তাধারা মাঝে মাঝে এমন চড়ায় ঠেকে যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় সমগ্রজীবন ও জগৎ বিষয়ে মৌন উপলব্ধির উপর। এবং এ কথাও দার্শনিকমাত্রের জানা

৩১। প্রমথনাথ বিশী : বাঙ্গালা কবি, পৃ - ৭।

৪০। আবু সয়ীদ আইয়ুব : আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৬৮, পৃ - ১৪।

আছে যে, চরমমূল্য নিরীক্ষায় শেষ কথা বলতে পারে বুদ্ধি নয়, বোধি। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে ভিত্তি করে কোনো দর্শনই খাড়া করা যায় না।''[৪১]

অন্যপক্ষে''কবিকে সংস্কৃত অর্থেও কবি হ'তে হয় অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা। সেই কথাটা ভেবে বোধ করি কোলরিজ বলেছিলেন' No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher'".[৪২]

দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন একটা logical mind ছিল, তেমনি ছিল অসাধারণ কবিত্ব শক্তি। সেকারণে কবিত্ব ও তত্ত্বের টানা পোড়েনে রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য সত্যকারের এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠেছে। কানাই সামন্ত লিখেছেন,''.... স্বপ্নপ্রয়াণী দ্বিজেন্দ্রনাথ পণ্ডিত হয়তো ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় কবি প্রতিভাও স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ। অন্তর্লীন চিৎশক্তিকে ও ধীশক্তিকে ফুলে - পল্লবে ছায়ায় আলোয় ও বর্ণগন্ধের বিচিত্র হিল্লোলে আবৃত করিয়া স্বতউচ্ছ্বসিত অথচ সংযমিত রসশ্রী বিরাজ করিতেছে।''[৪৩]

রূপকাব্যের অন্তরালে দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার বলীয়ান কাঠামো না থাকলেই নয়। বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো রূপক কাব্যের কবির মধ্যে দার্শনিক প্রতিভা ও কবিত্বশক্তির এমন সংমিশ্রণ ঘটে নি। যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সেই কারণেই সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে শ্রেষ্ঠ রূপকাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচিত হতে পেরেছে।

৪১। আবু সয়ীদ আইয়ুব : আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৬৮, পৃ - ১

৪২। Coleridge Biographia Letararia, Vol.II, 1949, P-19.

৪৩। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' : কানাই সামন্ত আলোচনা পৃ -১৭১।

সারদা মঙ্গল : বিহারীলাল চক্রবর্তী

খেয়াই কাঁহারে দেবি ।

শ্রেষ্ঠ রূপকাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশিত হওয়ার একবৎসর পর কবি বিহারীলাল - চক্রবর্তী প্রণীত 'সারদামঙ্গল' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে । কাব্যটি প্রকাশের পর বিভিন্ন সমালোচক কাব্যটি কোন জাতীয় সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন । কারো মতে উক্ত কাব্যটি রূপকজাতীয়, কেউ কেউ কাব্যাভ্যন্তরে রূপকত্বের সন্ধান করেছেন । ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, ''বিহারীলালের ও দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য - সৃষ্টিতে ঢিল রহিয়াছে শুধু রূপকের আশ্রয়েই নয় প্রধানত কল্পনার স্বতঃস্ফূর্তিতে এবং রচনার স্বাচ্ছন্দ্যেও'।' [১] ডঃ সেনের মন্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায় যে তিনি 'সারদামঙ্গল কাব্য'কে রূপক কাব্য বলতে চেয়েছেন । অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর The Neo-Romantic Movement in literature প্রবন্ধে Myth - এর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের দিক থেকে শেলি ও বিহারীলালের সাদৃশ্য দেখেছেন । তিনি শেলির Alastor এবং Epipsychidion - রূপক রচনা দুটির সমন্বয় দেখেছেন'সারদামঙ্গলে' । বলেছেন, 'সারদামঙ্গল'. May be described as a Bengali version of a phantasmagory that should combine the two visions Alastor and Epipsycidion in one, revels in an intoxication of emotional transfiguration". [২] তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন সারদামঙ্গল - a "a phantasmagory in verse,... we may call this the mythopoeic method of poetic interpretation, of which the fundamental design is a phantom - like

---

১। ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ১৩৬২ পৃঃ - ৪১৮ ।

২। Brajendranath Seal, the Neo-Romantic Movement in Bengali Literature, New Essays in Criticism 1903, P-98.

succession of majestic shapes and images, stalking figure, allegories and symbols, rolling on in one vast, surging dream-like movement...".৩

ড: সেন ও অধ্যাপক শীলের বক্তব্য অনুসারে 'সারদামঙ্গল' কাব্যকে রূপক কাব্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। রূপক কাব্য লেখার প্রয়াস যে বিহারীলাল পেয়েছিলেন কয়েকটি তথ্য সেকথা প্রমাণ করে। বিহারীলাল যখন 'সারদামঙ্গল' রচনা করেন তখন বাংলা সাহিত্যে প্রভূত পরিমাণে 'রূপককাব্যে'র চর্চা চলছিল। দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সুধীরঞ্জন', বলদেব পালিতের 'কাব্যমঞ্জরী', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ', কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবনোদ্যান' প্রকাশিত হয়েছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'আশাকানন', 'কায়াময়ী' রূপকাশ্রয়ী কাব্য লিখেছিলেন। বিহারীলাল বাংলা কাব্য চর্চায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন গভীরভাবে এবং তাঁর কাব্যজ্ঞানও ছিল প্রখর। সুতরাং প্রকাশিত রূপক কাব্যগুলির সঙ্গে তাঁর যে গভীর পরিচয় ছিল এবং এই সকল কাব্যদ্বারা তিনি যে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কেননা যুগপ্রভাব স্বীকার কবির ধর্ম। উপরন্তু 'সারদামঙ্গল' রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্থক রূপককাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশিত হয়েছিল। ঠাকুর পরিবার বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিহারীলালের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিপিনবিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ থেকে আমরা একথা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন, ''যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল .... দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল।''৪ অতএব এ অনুমান অসঙ্গত হবে না যে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'- এর সঙ্গেও বিহারীলাল পরিচিত ছিলেন। রূপক কাব্য লেখার প্রয়াস বিহারীলালের মনে ছিল বলেই সম্ভবতঃ তিনি 'সারদামঙ্গল' কাব্যটিকে পাঁচটি সর্গে বিভক্ত করেও কাব্যের নামকরণ করেছেন একটিই 'সারদামঙ্গল'। আর একথাই 'সারদাতত্ত্ব' বা 'সারদা পরিকল্পনা' সমগ্র কাব্যের মধ্যে, এমন কি পরিপূরক কাব্য 'সাধের আসনে'র মধ্যেও যোগসূত্র রচনা করেছে। পাঁচটি সর্গের একটিমাত্র নামকরণের মধ্য দিয়ে কবি যেন বোঝাতে চেয়েছেন তিনি একটি অখণ্ড দীর্ঘকাব্য লেখার প্রয়াসী। বিহারীলাল যখন কাব্যরচনা

৩। Brojendranath Seal, the Neo-Romantic Movement in Bengali literature, New Essays in Criticism 1903,P-98

৪। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ: - ১১।

করেন তখন বাংলা সাহিত্যে অখণ্ড দীর্ঘকাব্যের দুটি ধারা প্রচলিত ছিল — একটি মহাকাব্যের ধারা, দ্বিতীয়টি রূপকাব্যের ধারা। 'সারদামঙ্গল' যে মহাকাব্য নয় একথা সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং তিনি দীর্ঘকাব্যের দ্বিতীয় ধারা 'রূপকাব্য'কে বেছে নিয়েছিলেন এ অনুমান অসঙ্গত হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''বিহারীলাল তখনকার ইংরাজি ভাষায় নবাশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না — তিনি নির্জনে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।'' [৫] যুগপ্রভাবকে অস্বীকার করতে না পারায় নিভৃতে আপন ছন্দে আপনার কথা বলতে বসে কবি বিহারীলালের কাব্যে রূপকল্পের আভাস লেগেছে। কাব্যান্তরেও রূপকল্পনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রথমসর্গে উষার বর্ণনায় রূপকল্প সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে তরুণী উষা পূর্বাকাশের তোরণদ্বারে আবির্ভূতা। তার —

''চরণ - কমলে লেখা আধ আধ রবি রেখা
মস্তকে সোনার আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।''

রাত্রির শেষে দিনের সূচনায় পূর্বদিগন্তে যখন আঁধার আলোর আলিঙ্গন তখন উষাদেবীর রূপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবার কথা নয়। কবিও তাই অতি সূক্ষ্ম তুলিকায় উষাদেবীর সাঙ্কেতিক চিত্রখানি অঙ্কিত করেছেন। বহির্বিশ্বের সৌন্দর্যমূর্তি উষার আবির্ভাব বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি যেন তাঁর কবিত্ব উন্মেষের কাহিনী বলতে চেয়েছিলেন। উষার আবির্ভাব কাল যেমন আঁধার আলোর সম্মিলন তেমনি কবিত্বের উন্মেষকালও অস্পষ্ট।

৫। রবীন্দ্রনাথ : আধুনিক সাহিত্য : বিহারীলাল - ১৯৬৬, পৃঃ - ২৫।

আবার ঊষার পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার মধ্যে যেমন চারিদিক আলোকিত, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনি কবিদের বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটে কবির বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ঊষা দেবীর সাথে সাথে কবি কাব্যের দেবী বীণাপাণি সারদাকে আমন্ত্রণ করেছেন। মুহূর্তমধ্যে দেখি কবির মুদ্রা-কমল যে বীণাপাণির চরণস্পর্শ কামনা করেছে সেই বীণা-পাণী কবির হৃৎকমলে বিরাজিতা এবং তিনি আর কেউ নন — কবির পূর্ববন্দিতা ঊষাদেবী। তাঁর —

''কপোলে মৃদুহাস্য ভাস, অধরে অরুণ হাস
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা দুলে।''

এইভাবে প্রকৃতি ঊষা মুহূর্তমধ্যে কবির মুদ্রা - পদ্মের বীণাপাণিতে পরিণত হয়েছেন। অন্তর - বাইরের মিলনে কবি বলেছেন —

''তুমি সাধনের ধন জ্ঞান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই র'লো।''

বাস্তবিক সৌন্দর্য ঊষা। অন্তর সৌন্দর্য সারদা — উপমেয় ও উপমানের অভেদাত্মে রূপক অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। এরপর আদি - কবি বাল্মীকির আশ্রমে সৃষ্টির আদি -প্রভাতে সরস্বতীর আবির্ভাবের রূপক কাহিনীও চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তখনও সারদার রূপের সঙ্গে ঊষার রূপের অভিন্নতা।

''করে ই-দ্রধনু বালা, গলায় তারার মালা,
শীতাংশু মুকুট চুলে, কণ্ঠলে কানন,
কর্ণে কিরণের ফুল, সোদামিনী চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।''

তবে প্রথমদর্শে রূপকল্পের সন্ধান পাওয়া গেলেও পরবর্তী সর্গগুলিতে বিহারীলাল পথভ্রষ্ট

— হয়েছেন। কবির কাব্যসম্পর্কে তাঁর কি অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকে কাব্যবিচারে সেই অভিপ্রায়ের মূল্য তত নেই। এ সম্পর্কে Wimsatt বলেছেন, "The design or intention of the author is neither available nor desirable as a

সুতরাং কাব্যহিসাবে 'সারদামঙ্গল' - এর বিচার অন্যত্র। প্রসঙ্গত স্মরণীয় বাংলা - সাহিত্যে পশ্চিমী ধারার ভগীরথ হয়েছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ। রঙ্গলাল বিদেশী প্রভাবে কাহিনী প্রধান কাব্যকে দিয়েছিলেন নতুনরূপ — পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), কর্ম্মদেবী (১৮৬২), কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯) তাঁর কাহিনীকাব্য। মাইকেলের হাতে এই কাহিনীকাব্য গোত্রান্তর লাভ করে সমুন্নতি লাভ করেছিল এপিকে। আর বিহারী-লাল, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ ও প্রেমপ্রবাহিনী এই কাব্যচতুষ্টয় প্রকাশিত করে সৃষ্টি করেছিলেন একটি স্বতন্ত্র ধারার — সেই ধারা গীতিকাব্যের ধারা নামে পরিচিত। কবি এই কাব্যগুলিতে বিষয়কে গ্রহণ করেও বিষয়ীর আত্মময়তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 'সারদামঙ্গল' এই ধারার বিশিষ্ট ফসল।

: - খ : -

রূপক কাব্যের আলোচনায় স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রথমসর্গ রূপকাত্মক হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ কাব্যটি কেন রূপককাব্য হয়নি। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে রূপককাব্যের বিভিন্ন আলোচনায় আমরা জেনেছি রূপককাব্যের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। রূপককাব্যে কবি বিশেষ কোন অমূর্ত পরিস্থিতি বা আবেগকে মূর্ত করে তোলেন। বিহারীলাল অমূর্ত সারদা ভাবনাকে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন রূপ দিতে। কিন্তু সারদারূপায়ণ তাঁর নিখুঁত হয় নি। অনেকক্ষেত্রেই জায়া - জননী অনভীপ্সিত

৬। Wimsatt & Beardsley/The Intentional Fallacy/The Verbal Icon, 1960, Page-31.

প্রাধান্য লাভ করেছে। কাদম্বরী দেবীও বারবার লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সে কারণে কবির ধ্যান অনেকক্ষেত্রেই লৌকিক স্মৃতির জগতে সীমাবদ্ধ থাকায় কবি কল্পনার প্রকাশ প্রায়ই উন্মার্গগামী হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ রূপকাব্য অনেক পরিমাণে কবির প্রকাশগত একটি কৌশল খানিকটা যান্ত্রিকতার ব্যবহার, তাই রূপকাব্য পূর্ব পরিকল্পিত। কিন্তু রূপকাব্য লেখার গঠনধর্ম, গৃহিনীপনা, যান্ত্রিকতা বিহারীলালের ব্যক্তি ও কবির সত্তার একেবারেই বিরোধী। কেননা তার মনের আবেগ স্বতঃস্ফূর্ততায় বিকশিত। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, "মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতী বিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।"[৭] যে কবি 'উন্মত্তবৎ' হয়ে কাব্য রচনা করেন তারপক্ষে পূর্ব পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়, আর পূর্ব পরিকল্পনা করলেও তা রক্ষা করা কষ্টসাধ্য। সে কারণে সর্গবন্ধ কাব্য রচনা করলেও পরিকল্পনাগত ভাবৈক্য রক্ষা করতে সক্ষম হন নি বিহারীলাল। 'সারদা'র ধ্যানে উন্মত্ত কবি উদ্‌ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করেছেন। ফলে রূপককাব্যের গঠন-সৌকর্যের প্রয়োজন তা তিনি নির্মাণ করতে সক্ষম হন নি। ভাবজগত ও রূপজগতের মধ্যে প্রতিনিয়ত পট পরিবর্তন পাঠকের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

আলোচ্য কাব্যের প্রথম ও তৃতীয় সর্গের মধ্যে ভাবগত একটা সংযোগ আবিষ্কার করা গেলেও চতুর্থ সর্গকে 'সারদা' প্রসঙ্গে অবাঞ্ছিত বলেই মনে হয়। এই সর্গে তিনি হিমালয়ের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। আবার হিমালয় থেকে নেমে এসে পঞ্চমসর্গে কবির বিরহ যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। গঙ্গাকে অনুসরণ করে এসেছে কবির জন্মভূমি কলিকাতা আনন্দ নগরীর কথা। —— ঠিক এর পরের স্তবকে—

৭। অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত কবির পত্র।

যখন কবির হৃদয়োৎসারিত কাতর আর্তি প্রকাশ পায়,

'হে সারদে দাও দেখা ! বাঁচিতে পারিনে একা

কাতর হয়েছে প্রান, কাতর হৃদয়,

তখন কলকাতা নগরীর জন্য কেঁদে ওঠামন মুহূর্তের ব্যবধানে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বিরহে ব্যথিত হয় কেমন করে তা বুঝতে পারা যায় না। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন স্তবকগুলির মধ্যে এবং স্তবকনির্মিত বিভিন্ন সর্গগুলির মধ্যে যোগসূত্র সারদা-কল্পনা। সারদার সঙ্গে বিরহমিলনই কাব্যের বিষয়। কিন্তু 'সারদা' সম্বন্ধে কবির কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সারদার প্রকাশ ঘটেছে, এবং তাতেও বাধা ছিল না, যদি সারদা কোন ভাবমূর্তি অথবা কেবল মানবমূর্তি ধারণ করতেন। বাল্মীকির হৃদয়ে কবিত্বের আবির্ভাব সঙ্গতিপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন শুনি —

আহা সে পুরুষবর না জানি কেমনতর,

দাঁড়ায়ে রজত গিরি অটল সুধীর।

উদার ললাট ঘটা, লোচনে বিজলী ছটা,

নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর।

তখন সারদার সঙ্গে তাঁর যোগ আবিষ্কার করতে না পেরে বিমূঢ় হতে হয়।

'সারদামঙ্গল' কাব্যে বিহারীলাল মনে মনে বহু স্বর্গমর্ত্য পরিভ্রমণ করে নানা ভাবসংঘাতের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে 'সারদার' সান্নিধ্য কামনা করেছেন। ওই দেবীকে কখনও মর্তের কারাবন্ধনে জননী ও জায়ার সীমাবদ্ধ মূর্তির মধ্যে কখনও নির্বস্তুক বিশুদ্ধ চৈতন্যের ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু যখনই তিনি সারদাকে সীমাবদ্ধ পার্থিব প্রতীকের মধ্যে অবধারণ করতে গেছেন, তখনই -

তাঁকে দেশকালাতীত রহস্য সমুদ্রে হারিয়ে ফেলেছেন। সারদার তত্ত্বরূপ - যা তিনি স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন - ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে ততবেশী অস্পষ্ট করে তুলে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের সমন্বয় রক্ষার্থে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন - বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের সমান্তরাল অবস্থান যা রূপকাব্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, '' আত্মতন্ময়তা ও ভাবনিমগ্নতাই বিহারীলালের কবি প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ, কিন্তু ভাবাবেগের সমন্বয় নহে, ' ভাবাতিরেক 'সারদামঙ্গলে' লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে প্রথম সর্গটিতে সারদার ব্যক্তিক - নৈর্ব্যক্তিক রূপ চমৎকার সমন্বয় ও সাংকেতিকতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী সর্গগুলিতে সারদার সহিত কবির বিরহমিলনের উচ্ছ্বাস বহুল অতি পল্লবিত বর্ণনাই প্রধান। একথা অনস্বীকার্য যে, সারদার চিত্রণে প্রথম সর্গই যথেষ্ট এবং প্রকৃত কাব্যবিচারে প্রথম সর্গেই কাব্যের সমাপ্তি। পরবর্তী সর্গগুলিতে ভাবের অতিবিস্তার ঘটিয়াছে।'' ৮ মোহিতলাল মজুমদার সারদামঙ্গল কাব্যে কবির তিনটির অবস্থার কথা বলেছেন - জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা। জাগর ও স্বপ্ন অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া গেলেও, সুষুপ্তির অবস্থার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। সুষুপ্তি অবস্থায় কবি বিহারীলাল যোগী-বিহারীলালের কাছে পরাস্ত হয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা সেই আলোচনায় আসছি।

-: ঘ :-

রূপকাব্য রচনায় কবির অসার্থকতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে বিশুদ্ধ কবিত্বের কারণে নিশ্চিত রূপক কাব্য রচনার সার্থকতা তাঁর ভালে জয়টীকা এঁকে দেয়নি। বিহারীলাল সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন,

---

৮। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, ১৩৬৭, পৃ ৩১।

– বিহারীলালের ''হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত , তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন ।''[৯] রবী-দ্রনাথের মতে, ''তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত । -- তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল – তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ । তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল ।''[১০] কবিত্ব ও দার্শনিকতার সংমিশ্রণে সার্থকরূপক কাব্য গড়ে ওঠে । দ্বিজেন্দ্রনাথ কবিত্বকে দার্শনিকতায় সংহত করেছিলেন । কিন্তু বিহারীলালের আবেগ দার্শনিকতাকে ছাড়িয়ে পরিবিস্তারী কল্পনায় পরিণত হয়েছে । বিহারীলাল আবেগে ভোর হয়ে কাব্যরচনা করেছেন । সে কাব্য জীবনের গভীরতর আনন্দ উপলব্ধির উৎস থেকে উৎসারিত তার ভাবে আবেগে ও ভাষায় অস্পষ্টতা থাকা খুবই স্বাভাবিক । ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, ''বিহারীলালের কবিত্ব পেশাদারি মাল নয়, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ । তাই তাঁহার কাব্যসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গ এবং তাঁহার জীবনলীলার অধীভূত । ... প্রধানত এই আবেগ আবিলতার জন্যই বিহারীলালের অকৃত্রিম প্রৌঢ় কবিত্ব তখনকার কাব্যরসিকদের নজর এড়াইয়া গিয়াছিল ।''[১১]

বিহারীলাল মূলতঃ ছিলেন রোম্যান্টিক কবি । রোম্যান্টিক কবির সৌন্দর্যপ্রীতি বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল । 'সারদামঙ্গলকাব্যে' কবি যে প্রেমের গান গেয়েছেন তা বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি সব ভুলানো

১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত : ১৯৪২ সম্পাদিত জীবনকথা, পৃঃ - ৩ ।

১০। জীবনস্মৃতি : সাহিত্যের সখী, পৃঃ - ৭৩ ।

১১। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস , ২য় খণ্ড

পৃঃ - ৩১৭ ।

প্রেমের গান।" সে গান অশরীরী সৌন্দর্যের গান, সে বীণাধ্বনি অপরিচিত সে সুর কল্পনা কানন - বিহারী অশরীরী অঙ্গের সমীর চুম্বন''[১২] কিন্তু কবি যে অপার্থিব সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন সেই সৌন্দর্যভাবনা কবির অমূর্ত কল্পনা হতে উৎসারিত হয় নাই। পার্থিব নারীর মধ্যে তিনি সারদার রূপ প্রত্যক্ষ করে রূপ — ধ্যানকে অরূপ কল্পনায় মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুরদাস যে অরূপের ধ্যান করেছে সে ধ্যান রূপ হতে উদ্ভূত নয়। অন্যপক্ষে বিহারীলাল লৌকিক জীবনে রমনীর মধ্যে যে মাহাত্ম্য - মাধুরী অনুভব করেছেন তাই বিশুদ্ধীকৃত হয়ে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কবি সর্বভূতে কান্তিরূপে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে উপলব্ধি করেছেন।

"যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্য ডুবিয়া যাই,
অত্যুল্লাসকারী, অয়ি
পরম আনন্দময়ি। —
কে তুমি মা? কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাসিত।''

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসসুন্দরীকে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে অলোক - বসনা মূর্তিতে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যলক্ষ্মী সম্পর্ক বাসনার নির্দ্বন্দ্ব নয়, তা ভক্তিরসে আপ্লুত। হৃদয় প্রতিমাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি তার উদ্দেশ্যে জীবন কুসুমগুলি অর্পণ করেছেন —

''হৃদয়ে প্রতিমা লয়ে থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান,
ভক্তিভাবে সদা স্মরি, মনে মনে পূজা করি,
জীবন কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।''

১২। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, ১৩৬৭, পৃঃ - ১৪৪।

এই সৌন্দর্য কান্তিতে ধরা দিয়েই কান্তিকে অতিক্রম করে গেছে —

''বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে, — অনুভবে আসে না,
তেমনি, এ বিশ্ব থেকে কান্তিখানি দূরে রেখে
চাও, বিশ্ব পানে চাও — কিছু কি দেখিতে পাও ?''

''সারদা''কল্পনায় রোমান্টিক কবির রহস্যবোধ কবিকে বারবার বিভ্রান্ত করেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন,

''রহস্য বিশ্বের প্রাণ, রহস্যই স্ফূর্তিমান্
রহস্যে বিরাজমান্ ভব।''

পরক্ষণেই আবার তাঁর মনে হল —

''রহস্য, মাধুরী - মালা — রহস্য, রূপের ডালা
রহস্য, স্বপন - বালা।''

কিন্তু কেবল রহস্যবোধেই কবির চিন্তার পরিসমাপ্তি নয়, রোমান্টিক বিস্ময়বোধও কবিচিত্তকে আলোড়িত করেছে। রহস্যের অনুসন্ধানে কবির জিজ্ঞাসাও তাই পরিব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বচরাচরে —

''কে তুমি মা মহামায়া, বিরাট বিচিত্র কায়া
দেখিতে বিহ্বলমন —
ভাবিতে বিহ্বল মন, কি রহস্যময়ী গো,
লভিতে তোমারে দেবী ও পরম পদসেবি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চিরপরাজয়ী গো।''
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিজয়ী দেবী মহামায়াকেই কবির প্রশ্ন —
কে তুমি সেজেছ নারী চিনেও চিনতে নারি
উদার লাবণ্যে তব ভরিয়া রয়েছে ভব।''

কবি বিশ্বচরাচরে তাঁর মানস – প্রতিমাকে সন্ধান করেছেন। কিন্তু সে দেবী অথবা নারী কবিকে চিরদিন 'হাসাল কাঁদাল চিরদিন দিল ফাঁকি।' বিহারীলাল অন্তরের অনুভূতিকে বাইরে সঙ্গীতের সুরে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এই সঙ্গীত ছিল তাঁর আত্মা সমাহিত ধ্যানের বহিঃপ্রকাশ। অন্তরের ভাবপ্রবাহ তাঁকে লৌকিক হতে অলৌকিক জগতে আকর্ষণ করেছে বারেবারে। তাই কবির 'হৃদয়প্রতিমা' 'কায়াহীন যথা ছায়া' এবং সৌন্দর্যে প্রেমে জ্ঞানে 'অন্তর ব্যাপিনী' হয়ে যোগমগ্ন কবির বিপুল মানসের বিরাজমানা –

''ভাবভরে মাতোয়ারা যেন পাগলিনী পারা
আহ্লাদে আপনহারা মুগ্ধা মোহিনী।''

ডঃ অসিতকুমার সিকদার তাঁর 'আধুনিক কবিতার ঐতিহ্য' প্রবন্ধে রোমান্টিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, ''চৈতন্য নয়, অবচেতন, যুক্তি নয় স্বপ্ন – তাকেই আবহমান রোমান্টিকতা কবিতার মূলধার বলে জেনেছে .... আদিম ও অবচেতন এই সত্তার উপর নির্ভরতা থেকেই সুরিয়ালিজমের জন্ম,। সচেতন আপরণে নয়,omnipotence of dream - এ এই আন্দোলনের আস্থা। ... এই আদিম অবচেতনায় আস্থা একদিকে যেমন স্তরে স্তরে নিয়ে যায় সুরিয়ালিজম - এর উৎসমূখীনতায়, অন্যদিকে অবচেতন জাত স্বপ্ন, যুক্তির অতীত স্বপ্ন, পর্দা সরিয়ে দিয়ে vision বা দিব্যদর্শন ঘটায়, উদ্ভাসিত হয় এশিক্সামির জ্যোতির্ময় অস্তিত্ব — যেমন রোমান্টিক কাব্যে তেমনি কখনো কখনো আধুনিক কাব্যে।'[১৩] বিহারীলালের এই দিব্যদর্শন ঘটেছিল। এই দিব্যাবস্থাকে প্রমথনাথ বিশী 'ভাবোন্মাদ ও দিব্যোন্মাদ'[১৪] বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৩। অসিতকুমার সিকদার : আধুনিক কবিতার দিকবলয়, ১৩৮৬ পৃঃ - ৮ - ১।

১৪। প্রমথনাথ বিশী : বিহারীলাল রচনাসম্ভার, ১৩৬৮, ভূমিকা।

রূপক কাব্য রচনায় অসার্থকতার আরেকটি কারণ বিহারীলাল প্রকৃতপক্ষে গীতিকবি। গীত বা কাব্যগীতি থেকেই বিহারীলালের কাব্যরচনার সূত্রপাত। ''আর একটা শিক্ষাও মনে মনে আরম্ভ হইয়াছিল এটী ভাবী কবির গান শিক্ষা, অবশ্য এ শিক্ষাটিও কোনরূপ নিয়মাধীন ছিল না। বিহারীলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণ সাধ পরিতৃপ্ত করিতেন। .... ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বাটীতে আসিয়া সেগুলিকে স্মরণে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিস্মৃত হইলে তাহা নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন। এইরূপ পরিচিত গীতের অংশ পূরণ করিতে করিতে তিনি আপনি গীতিরচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই বিহারীলালের কবিতা রচনার প্রথম উদ্যম।''[১৫] পরবর্তীস্তরে তিনি বহিরঙ্গ সুর বর্জন করে অন্তরঙ্গ সুরাশ্রিত কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। এইভাবে কাব্যগীতি থেকে গীতি - কবিতায় তাঁর উত্তরণ ঘটে। বিহারীলাল 'সঙ্গীতশতক' থেকে 'সারদামঙ্গলে' পৌঁছে যান।

কাহিনী রূপক – বক্তব্যকে অতিক্রম করে 'সারদামঙ্গলে' কবির প্রাথমিক লক্ষ্য হয়েছে আত্মপ্রকাশ। পাঠক যেন আড়ি পেতে এই কবিতা শোনে। আর এই কাব্যে ঘটেছে আত্মভাবের উদ্বোধন। এসবই গীতিকবিতার লক্ষণ। গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, ''গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সে উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।''[১৬] গান থেকে যেমন কবিতায় পদার্পণ করেছিলেন বিহারীলাল তেমনি 'সারদামঙ্গল' কাব্যের জন্মেতিহাসের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ আছে। বিহারীলাল 'সারদামঙ্গলে'র জন্ম সম্পর্কে বলেছেন, ''সর্গাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিনীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম, সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর।

১৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বিবরণ, পৃঃ - ৩।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিম রচনাবলী - গীতিকাব্য, ১৩৮৪, পৃঃ - ১৮৭।

গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকিমুনির পূর্ববর্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী মূর্ত্তি রচনা-তর আমার চির আনন্দময়ী বিশ্বাদিনী সারদার কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।''[১৭]

'সারদামঙ্গল' কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, ''বিহারী - লালের কাব্য যেন আদি লিরিক জাতীয়, তাহার প্রেরণা একেবারে গীতাত্মক। বাহিরের ভবকে গীতিকবি নিজস্ব ভাব কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া যে একটি বিশেষ রূপ ও রসের সৃষ্টি করেন, ইহা তাহা হইতেও ভিন্ন। কবি নিজের আনন্দে ধ্যানকল্পনার আবেশে, সর্ব্বত্র নিছক ভাবের সাধনা করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের প্রধান লক্ষণ ভাব বিভোরতা, তাঁহার কল্পনা অভিব্যক্তিমুখ সাবজেক্টিভ, তিনি যখন গান করেন, তখন সম্মুখে শ্রোতা আছে এমন কথাও ভাবেন না, ভাবকে স্পষ্টরূপ দিবার আকাঙ্খাই তাঁহার নাই।''[১৮]

গীতিকাব্য হিসাবে বিচার করলে শুধু যে সারদামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় তাই নয় তার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগকে খণ্ডন করা সহজ হয়। একজন 'মর্ম্মজ্ঞ সীমন্তিনী' (কবির ভক্ত পাঠিকা কাদম্বরী দেবী) তাঁকে যে সাধের আসন বুনে দিয়েছিলেন তাতে মূল শিল্পির দ্বারা লিখিত হয়েছিল সারদামঙ্গলের কয়েকটি পঙক্তি —

''হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
চুলুচুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?''

১৭। অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লিখিত বিহারীলালের পত্র।

১৮। মোহিত লাল মজুমদার : আধুনিক বাংলা কাব্য, ১৯৭৩, পৃঃ - ৪২।

এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়েই কাদম্বরী দেবী যেন বলতে চেয়েছিলেন সারদামঙ্গলের কবি যাকে ধ্যান করেছেন তার মূর্তি স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। কাদম্বরী দেবীর পর থেকে সমালোচকেরা বারে বারে এই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সারদামঙ্গলের বিরুদ্ধে করেছেন। তাঁদের কাছে কাব্যটি দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছিল কারণ তাঁরা কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাব্যটিকে পাঁচসর্গে বিন্যস্ত একটি অখণ্ড সমগ্র কাহিনী বা রূপ-ধর্মী কাব্যরূপে বিবেচনা করতে চেয়েছেন। এবং তার মধ্যে পূর্বাপর ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ বক্তব্য প্রত্যাশা করেছেন। সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ বক্তব্য না পাওয়ায় কাব্যটি তাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য বিবেচনায় ভিন্ন-সূত্র প্রস্তাব করেছেন।

—''প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি-রূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ সহজে কষ্ট হয় না।''[১৯] খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতার সঙ্কলন হিসাবে সারদামঙ্গলকে বিচার করলে তার প্রত্যেকটি অংশকে স্বতন্ত্র গীতিকবিতারূপে আস্বাদন করা যায় এবং তার অর্থও স্পষ্ট হয়। সমগ্র 'সারদামঙ্গল' ও 'প্রেমের প্রমন' ব্যাপ্তে কবি যে 'সারদার ধ্যান করেছেন সে সারদা কোথাও স্পষ্টরূপ ধারণ করে নাই।' সর্বত্রই খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভাবনার রূপকল্পন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সারদামঙ্গল' এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সঙ্গীতে নিবিড়ভাবে মুগ্ধ হইলাম। অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসঙ্গত অর্থ করিতে পারিলাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে।''[২০] বাস্তবিকই 'সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদা-মঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয় কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে

১৯। রবীন্দ্রনাথ : আধুনিক সাহিত্য, বিহারীলাল পৃ - ৩৬।

২০। রবীন্দ্রনাথ : আধুনিক সাহিত্য : বিহারীলাল — ৩৫ - ৩৬।

ধারণ করে রাখে না।''[২১] 'সারদামঙ্গল' কাব্যে কবির এই অস্থায়ীভাবাচ্ছন্নের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় কবি এমন একটি বিষয়কে কবিতায় উপস্থিত করতে চেয়েছেন যে বিষয়কে কবিতায় উপস্থিত করা কঠিন। সারদা, কবির কাব্যলক্ষ্মী এক পলকের জন্য জ্যোতির্ময়ী বালিকার মত কবির মর্মচক্ষুকে ধাঁধিয়ে দিয়ে অন্তর্হিতা হয়েছেন। তীব্র আলোক সম্পাতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলে সবকিছু যেমন অস্পষ্ট হয়ে যায় তেমনি কবির চোখে ধাঁধাঁ লেগেছে। 'সারদামঙ্গল' কাব্য সারদাপ্রাপ্তির কাব্য নয়, সারদা অনুসন্ধানের কাব্য। যাকে তিনি এক পলকের জন্য দেখেছেন তাকেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন বলে তার কোন স্পষ্ট রূপকে কবিতায় মূর্ত করতে পারেননি। H. M. Dasgupta মহাশয় বলেছেন, "It is an expression of the inexpressible, an embodiment of the unbodied good, a permanence given in a very rare moment to the vision of that tremulous light in man, such as he beheld at the down of creation and is beholding even now". [২২]

শেলি যে সৌন্দর্য - ধ্যানের পরিচয় তাঁর Hymn to Intellectual Beauty কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন তাই জগৎ ও জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে Adonais ও Epipsychidion কবিতাদ্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শেলির 'Intellectual Beauty' ই বিহারীলালের সারদা। কবি জগৎ বিধায়িত্রী শক্তির পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,

''প্রভাতে বিরাজমান
সর্বভূতে অধিষ্ঠান
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপম।''

২১। রবীন্দ্রনাথ : আধুনিক সাহিত্য, বিহারীলাল - ৩৫ - ৩৬।

২২। H.M.Dasgupta/Studies in Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry, 1857-1887, P-196.

সবচেয়ে বড় কথা রোমান্টিক কবি ও গীতিকবি শেষপর্যন্ত মিস্টিক কবিতে পরিণত হয়েছেন। এক মিস্টিক উপলব্ধিকেই কবি যেন রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁর সমগ্রকাব্যে। প্রসঙ্গত: স্মরনীয় 'সারদামঙ্গলে'র পরিপূরক কাব্য 'সাধের আসনে' এই মিস্টিক অনুভূতি প্রবল।

মিস্টিসিজমের প্রধান লক্ষণ - সে হৃদয়ে আনে একটা গভীর বিশ্বাস। এ বিশ্বাস বুদ্ধির জগতে নয়, হৃদয়রাজ্যের অনুভবের বস্তু। এ প্রসঙ্গে Bertrand Russell এর উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য — "But the mystic lives in the full light of the vision : What others dimly seek he knows with a knowledge beside which all other knowledge is ignorance". ২০

'সারদামঙ্গলের' কবি 'সাধের আসনে' মনঃসমীক্ষণ বা অনুব্যবসায়ে (Introspection) বসেছেন, কিন্তু প্রাতিভচক্ষুতে (Intuition) যে রসবর্ণনা সম্ভব, শব্দের 'অভিধা শক্তি' (Function of denotation) সেখানে নিষ্ফল। তাই মূলে ছন্দ আত্মভাবনায় মিলে কাব্যে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তা পাঠককে পৌঁছে দেয় রূপ থেকে রাগিনীতে, স্পষ্টতা থেকে অস্পষ্টতায়। কেননা সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য — "it is not to be heard but overheard". - রোমান্সের বৈচিত্র্যসৃষ্টি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও 'সারদামঙ্গলে'র পরিণাম হল কবির একাকিত্বের রসাস্বাদন, পাঠক সেখানে বাহুল্যমাত্র। কারণ মিস্টিক অনুভূতি এমন একটা ব্যক্তিসাধনা যা অনেকটা গুহ্যচারী ধর্মসাধনার মতো একক উপলব্ধির সামগ্রী 'সাধের আসনে' কবি টীকা ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়ে এই উপলব্ধিকে মূর্ত করতে গিয়ে আরও বেশী প্রহেলিকাময় করে তুলেছেন।

২০। Bertrand Russell:Mysticism and logic - 1953, P-9.

কবি বলেন –

''ঘোর ঘোর অন্ধকার কি এক রহস্যময়
শান্তিময়, তৃপ্তিময়, ভুলায় নয়ন ।''

অথবা –

''রহস্য, মাধুরী - ঘালা – রহস্য, রূপের ডালা –
রহস্য স্বপনবালা
খেলা করে মাথার ভিতরে ,

মিস্টিক কবির মতই কবি আলো - আঁধারি স্বপ্নময়তার মধ্যে আত্মোপলব্ধি এবং আত্মান্বেষণের প্রয়াস পেয়েছেন । কিন্তু যেখানে বুদ্ধির প্রদীপ্ত আলোকে আত্মোপলব্ধির স্বরূপ প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন সেখানে তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে —

''এত বড় কাণ্ডখানা, বুঝিতে না যায় জানা ।
বাইবেল, কোরাণ, বেদ মেটেনা মনের খেদ ।
দর্শন শাস্ত্রের গাদা কেবল বাড়ায় ধাঁদা ।

অন্ধকার ঐশ্বর্য গ্রাস করে কবিকে –''কি ঘোর তিমির রাশি, ফেলিল ফেলিল গ্রাসি ।''
তাই শেষ পর্যন্ত কবির প্রার্থনা 'আপন রহস্য মাঝে আপনি ঘুলিয়া দাও ।'

বিহারীলালের মিস্টিক কবি পরিচয় তাঁর চিত্রকল্পের আবেদনে বর্তমান । 'সুবর্ণমালিনী', 'কাঞ্চন কমলবাসিনী' কিম্বা 'শ্বেতশতদল' দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভবের বস্তু – কিন্তু 'মানসমরালীমম আনন্দরূপিণী'র আবেদন অন্তরেন্দ্রিয়ের কাছে' –

আবার ''জ্যোতির প্রবাহ যাবে
বিশ্ব বিমোহিনী রাজ্ঞ
কে তুমি লাবণ্যলতা মূর্তি মধুমিমা ।''

এখানে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য বা বুদ্ধির সংকেত কবির চিত্রকল্প অনুধাবনে অসহায়। সৌন্দর্যের অবস্থান অন্তর্জগতের উপলব্ধির নিবিড়তায়। এই কারণে ভাবের প্রতি ঐকান্তিকতা ও গভীরতা যতটা হৃদয়গ্রাহী, ভাবমূর্তি ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

উপরিউক্ত আলোচনায় নঃ করলায় বিহারীলাল তাঁর কাব্যের জন্য যে বিষয় নির্বাচন করেছেন 'রূপকাব্য' হয়ে ওঠবার পক্ষে সেই বিষয় তাঁকে সাহায্য করে নি। শুধু 'বিষয়' নয় — কাব্যের ভাষাও তাঁর পক্ষে অন্তরায় হয়েছে। যে দিব্য অনুভূতি হৃদয়ের একটি বিশেষ ভাবাবস্থা তা চিরকালই অনির্বচনীয়। ভাষার একটা নির্দিষ্ট শক্তি আছে — এর পর ভাষা নিজস্ব শক্তির আচ্ছাদন ত্যাগ করে নীরবতার গভীরে অবগাহন করে, এবং ভাষার প্রান্তীয় ডিঙিয়েই সত্যের সার্থক উপলব্ধি ঘটে। George Steiner বলেছেন, '' The highest purest reach of the contemplative act is that which has learned to leave language behind it. The ineffable lies beyond the frontiers of the word''.[১৪]

মিস্টিক কবির চেতনা সাধারণ চেতনা থেকে পৃথক। বিহারীলাল যেহেতু মিস্টিক কবি সেকারণে সাধারণ পাঠক আমরা তাঁর চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারি না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মিস্টিক কবিতা সম্পর্কে যেকথা বলেছেন তা অনুধাবন যোগ্য, ''ঢেউয়ের মধ্য দিয়া নদীধারার সহিত যে বিচ্ছেদ কুণ্ড জলের ঘটিয়াছে তাহারই ভাবস্মৃতি বা বাসনা নস্থবাসনার যে অতি গভীর স্তরে ঘুমাইয়া থাকে তাহাকে 'অতিনস্থ বাসনা' বলা যাইতে পারে। যে কবিপ্রতিভা এই অতিনস্থবাসনার অতলতা হইতে ঢেউয়ের গান তুলিতে সক্ষম হয় তাহাকে আমরা মিস্টিক কবিপ্রতিভা বলি। ... এই মিস্টিসিজম্ যদি ভাবমূলক না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অভাবাত্মক হইত, অর্থাৎ যাহাকে কখনও পাই নাই তাহাকে পাইবার ব্যাকুলতাই যদি ইহার একমাত্র ঔত্তেজক কারণ হইত তবে

১৪। George Steiner/Language and silence - 1967 Retreat from the word, Page-31.

মিস্টিক কাব্যে অসীমের সহিত লীলার প্রকাশ দেখিতে পাইতাম না। এ লীলায় মিলনের ভাবস্মৃতি আছে বলিয়া বিরহ গভীর ও মধুর হইয়াছে।''[২৫]

বিহারীলালের মিস্টিক কবিপ্রতিভা ছিল। তিনি অতি-লব্ধ বাসনার 'অতলতা' থেকে অসীমের লীলাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। পাঠকের পক্ষে এই 'উপলব্ধি' অনুভূত করা সম্ভব নয়। কেননা – "their special kind of consciousness is such that it cannot in any way be understood interms of the common consciousness or its categories, because they have nothing in common except the fact of being consciousness". [২৬] এবং "The difficulty with language is therefore probably a function of the difference between the two kinds of consciousness". [২৭]

"যুদ্ধাবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিদের আছে সেই বেড়াভাঙার কাজ। "... একদিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর একদিকে অস্পষ্ট কথারও। একদিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষা সীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেতচিহ্নে, আর একদিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূর প্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অন্যথা করেই ভাবের ইশারা তৈরি করতে বসেছে।'' [২৮] অনেক সময় দেখা যায়

২৫। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : কাব্যপরিক্রমা - ১৩৭৩ পৃ - ১১১ - ১৩।

২৬। W.T.Stace/Mysticism and philosophy, P-280.

২৭। ঐ

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খণ্ড, কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।

কাব্যে ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করতে পারে না। কেবল লক্ষ্যকে নির্দেশ করে দেয়। এছাড়া ভাবের আবেগে ভাষায় একপ্রকার বিস্মৃতভা জন্মে, কাব্যে তার ব্যতিক্রম হলে কাব্যের ব্যাঘাত হয়। উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি বিহারীলাল ভবঘোরে বিভোর হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি বিহারীলাল শেষপর্যন্ত যোগী বিহারীলালের কাছে পরাভূত হয়েছেন। সেকারণে 'সারদামঙ্গল' - 'সাধের আসন' রূপক কাব্য না হয়ে যোগির ধ্যানকাব্য হয়ে উঠেছে। কবি বিহারীলাল যে ভাবটিকে 'চিনেও চিনতে' পারেন নি তাঁকে ভাষার মাধ্যমে কি করে প্রকাশ করবেন ? তাই কবির অবিনয় অভিব্যক্তি : —

''ধেয়াই কাঁহারে দেবি, নিজে আমি জানিনে।
কবি গুরু বাল্মীকির ধ্যান - ধনে চিনিনে,
মধুর মাধুরী - বালা, কি উদার করে খেলা,
অতি অপরূপ রূপ ——
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।''

কবির বক্তব্য ভাষা সীমার বেড়া ডিঙিয়ে ভাষাতীত চিহ্নে পৌঁছে হৃদয়চারী হয়েছে। কিন্তু তা রূপক - কাব্য রচনার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়।